দারসে কুরআন

২

অধ্যাপক আবদুল মতিন

দারসে কুরআন

২য় খন্ড

অধ্যাপক আবদুল মতিন

www.icsbook.info

দারসে কুরআন- দ্বিতীয় খন্ড

প্রকাশনায় ঃ সাহাল প্রকাশনী
৩০৮, খানজাহান আলী রোড,
(তারের পুকুর) খুলনা।

প্রকাশকাল ঃ
১ম প্রকাশ ঃ মে- ২০০৪ ইং
১৬তম প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর- ২০১৩ ইং
ঃ পৌষ- ১৪২০ সন
ঃ সফর- ১৪৩৫ হিজরী

সত্ত্ব ঃ লেখক কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত।

প্রচ্ছদ ঃ কৃষ্টি কম্পিউটার,
৩০৮, খানজাহান আলী রোড, খুলনা।

অক্ষর বিন্যাস ঃ দেশ কম্পিউটার
৪৪/৩ শামসুর রহমান রোড, খুলনা।

নির্ধারিত মূল্য ঃ ৭০ টাকা

পরিবেশনায় ঃ সাহাল বুক কর্ণার
৩০৮, খানজাহান আলী রোড,
(তারের পুকুর) খুলনা।

মোবাইল ঃ ০১৭১১-৩৮৯০৭৬ (লেখক)
ঃ ০১১৯১-৭৮২২৮৬ (দোকান)

প্রাপ্তিস্থান

ইসলামিয়া লাইব্রেরী, বরিশাল।	কাটাবন বুক কর্ণার, ঢাকা।
আল-হেলাল লাইব্রেরী, যশোর।	ঢাকা বুক কর্ণার, পুরানাপল্টন, ঢাকা।
আল-আমীন লাইব্রেরী, সিলেট।	প্রফেসরস পাবলিকেশন, মগবাজার, ঢাকা।
আল-আমীন লাইব্রেরী, সাতক্ষীরা।	প্রফেসরস বুক কর্ণার, মগবাজার, ঢাকা।
একাডেমী লাইব্রেরী, দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম।	খন্দকার প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা।

এ ছাড়াও জেলা শহরের বিভিন্ন লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়।

www.icsbook.info

ভূমিকা

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

নাহ্‌মাদুহু অনুসাল্লি আ'লা রাসূলিহিল কারীম, আম্মা বা'দ। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন মহানবী (সাঃ) এর উপর নাযিলকৃত সর্বশেষ আসমানি কিতাব। যা মানব জাতির হেদায়েত এবং জীবন পরিচালনার জন্য পরিপূর্ণ জীবনবিধান। যাতে মানুষের ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক জীবন সম্পর্কে সমাধান দেয়া হয়েছে। সুতরাং প্রতিটি মুমিন মুসলমানের উচিত আল-কুরআনকে নিজের ভাষায় বোঝে তার শিক্ষানুযায়ী জীবন যাপন করা। কিন্তু সমস্যা হলো আমাদের দেশে সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় ভাবে কুরআনের সঠিক শিক্ষাকে তুলে ধরার তেমন কোনো উপযোগী ব্যবস্থা নেই। যতটুকু আছে তাও আবার সিলেবাসের গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং ভিন্নভাবে কুরআনকে চিত্রিত করা হয়েছে। যার কারণে কুরআনের প্রকৃত স্প্রীরিটকে নষ্ট করে দিয়ে সমাজের মানুষকে সঠিক শিক্ষা থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে।

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল-কুরআনের বিধি-বিধান মানতে হলে, কুরআনের সঠিক বুঝ থাকা জরুরী। কুরআনের সঠিক বুঝ সৃষ্টি এবং শিক্ষা গ্রহণের জন্য আমি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত সাধারণ মানুষের জন্য সহজ-সরল ভাষায় আল-কুআনের বিভিন্ন অংশ থেকে বিষয় ভিত্তিক 'দারস' লেখা আরম্ভ করি। আলহামদুলিল্লাহ্! ইতিমধ্যে দারসে কুরআনের **'প্রথম খন্ড'** প্রকাশিত হয়েছে এবং পাঠক ভাই-বোনদের মাঝে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। তাদের দাবী এবং পরামর্শ অনুযায়ী **'দ্বিতীয় খন্ড'** প্রকাশিত হলো। আগামীতেও পরবর্তী খন্ডগুলো লেখা এবং প্রকাশের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ্। এ ব্যাপারে আপনাদের সহযোগীতা এবং আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করছি।

দারসে কুরআন **'দ্বিতীয় খন্ড'** লেখা এবং প্রকাশের ক্ষেত্রে যেসব হিতাকাঙ্খী ভাই-বোন পরামর্শ ও অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন, তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং আল্লাহ পাকের কাছে তাদের জন্য উত্তম প্রতিদান কামনা করছি। লেখা এবং ছাপার ক্ষেত্রে ভুল-ক্রটি থাকা স্বাভাবিক। কোনো সুহৃদয় ব্যক্তির কাছে ভুল-ক্রটি ধরা পড়লে ও পরামর্শ থাকলে আমাকে অবগত করালে তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ থাকবো এবং ভবিষ্যতে সংশোধনের চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ্।

সবশেষে আল্লাহ্ পাকের দরবারে আমার আরজ, হে আল্লাহ্! তোমার এই পবিত্র মহাগ্রন্থের ব্যাখ্যা এবং শিক্ষা পেশ করতে গিয়ে যদি কোনো ক্ষেত্রে আমার বাড়াবাড়ি ও ভুল-ক্রটি হয়ে যায় তার জন্য তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও। আর আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করিও এবং কেয়ামতের সেই ভয়াবহ দিনে নাজাতের জারিয়া বানিয়ে দিও। আমীন।

বিনীত

মুহাম্মদ আবদুল মতিন
সহকারী অধ্যাপক, ইসলামীক স্টাডিজ বিভাগ
দৌলতপুর কলেজ, খুলনা।

www.icsbook.info

উৎসর্গ

কোলকাতা হাইকোর্টে দায়েরকৃত "কুরআন বাজেয়াপ্ত" মামলার প্রতিবাদে ১৯৮৫ সালের ১১ই মে, চাঁপাই নবাবগঞ্জের ঈদগাহের আম্রকাননে পুলিশের গুলিতে নিহত আট শহীদের স্মরণে।

www.icsbook.info

২য় খন্ডের সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা নং
১। জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব	(সূরা ঃ আলাক-১-৫)	৭
২। মুমিনের জেন্দেগী হবে তাকওয়া, আন্দোলন ও দাওয়াতী জেন্দগী	(সূরা ঃ আলে-ঈমরান-১০২-১০৪)	২০
৩। মুমিন জীবনের লক্ষ-উদ্দেশ্য ও তাদের বৈশিষ্ট্য	(সূরা ঃ তওবাহ-১১১-১১২)	৪৬
৪। মুমিনদের ছয়টি বর্জনীয় আচরণ	(সূরা ঃ হুজুরাত-১১-১২)	৬৯
৫। দুনিয়াদারদের প্রতি সতর্ক বাণী	(সূরা ঃ তাকাছুর-১-৮)	৯৪
৬। ইসলামী আন্দোলন ঃ কর্মীদের গুণাবলী	(সূরা ঃ মায়েদাহ-৪৫-৫৬)	১১০
৭। আল্লাহর কতিপয় কুদরাত ও নেয়ামত	(সূরা ঃ আন নাবা-১-১৬)	১২৭
৭। মুনাফিকদের আচরণ	(সূরা ঃ বাকারা-৮-১৬)	১৪৩

১ম খন্ডে যা আছে	৩য় খন্ডে যা আছে
○ দারসে কুরআন এর বক্তৃতা দান পদ্ধতি। ○ দারসের সময় বন্টন। ○ দারস দানকারীর করণীয়। ○ দারসের কতিপয় পরিভাষার সংজ্ঞা। ○ এক নজরে আল-কুরআনের পরিচয়। ○ মুত্তাকীনদের গুণাবলী, (সূরা- বাকারা-১-৫) ○ মু'মিনদের গুণাবলী। (সূরা- মুমেনুন-১-১১) ○ বাড়ীতে ঢোকার শিষ্টাটার। (সূরা-নূর-২৭-২৯) ○ ধ্বংস ও ক্ষতি থেকে মানুষের বাঁচার উপায় (সূরা- আল আসর) ○ কঠিন আযাব থেকে বাঁচার উপায়। (সূরা-সফ্-১০-১২) ○ মানবতার মুক্তির জন্য জিহাদ। (সূরা-নিসা-৭৫-৭৬) ○ ঈমানের পরীক্ষা। (আল ঈমরান-১৩৯-১৪১) ○ সবরের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য কামনা ও শহীদের মর্যদা। (সূরা- বাকারা-১৫৩-১৪১) ○ মরণের আগেই আল্লাহর পথে অর্থ খরচ। (সূরা- মুনাফিকুন-৯-১১) ○ কিয়ামতের দৃশ্য। (সূরা-হজ্ব-১-২)	○ জিহাদ বা ইসলামী আন্দোলনের গুরুত্ব (সূরা তাওবাহ-১৯-২৪) ○ কতিপয় সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ওয়াদা এবং কসম রক্ষা করার গুরুত্ব (সূরা নহল-৯০-৯৭) ○ অতীতের নবীদের দ্বীনের ন্যায় একই দ্বীনের দাওয়াত দান এবং প্রতিষ্ঠার নির্দেশ (সূরা-শু'রা-১৩-১৬) ○ ঈমানের পরীক্ষা দিয়েই জান্নাতে যেতে হবে (সূরা আনকাবুত-১-৭) ○ আল্লাহর উপর অবিচল ঈমান। সর্বোত্তম পন্থায় দাওয়াতদান ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন। (হা-মীম-আস- সাজদাহ-৩০-৩৬) ○ দাওয়াতে দ্বীনের কাজে অধৈর্য হলে চলবে না (আনয়ান-৩৩-৩৬) ○ স্ত্রী, সন্তান এবং ধন-সম্পদ মানুষের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ (সূরা তাগাবুন-১৪-১৮) ○ আখেরাতে অবিশ্বাসীদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ও কর্যকলাপ (সূরা মাউন)

www.icsbook.info

গ্রন্থপুঞ্জি ঃ

✪ তাফহীমুল কুরআন	মাওঃ সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী (রহঃ)
✪ তাফসীরে ইবনে কাসীর	মাওঃ হাফেজ ইমামুদ্দীন ইবনু কাসীর (রহঃ)
✪ তাফসীরে মা'রেফুল কুরআন	মাওঃ মুফতী মুহাম্মদ শাফী (রহঃ)
✪ তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন	সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ (রহঃ)
✪ বোখারী শরীফ	ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারী (রহঃ)
✪ মুসলিম শরীফ	ইমাম মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ নিশাপুরী (রহঃ)
✪ মেশকাত শরীফ	নূর মোহাম্মদ আযমী (রহঃ)
✪ রিয়াদুস সালেহীন	ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আননববী (রহঃ)
✪ হাদীস শরীফ	মাওঃ আবদুর রহীম (রহঃ)
✪ হাদীসে রাসূল (সাঃ)	অধ্যাপক হাবিবুর রহমান
✪ সংকলন (বিষয় ভিত্তিক কুরআন হাদীস)	অধ্যাপক মাওলানা আবদুল মতিন

আবেদনঃ দারসে কুরআন-এর সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আমার আবেদন, কুরআনের ব্যাপক প্রচারের জন্য অন্যদের মাঝে–পাড়ায় মহল্লায়, মস্‌জিদে, মক্তবে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আপনি দারসে কুরআন পেশ করুন। আপনার দারস্‌ পেশ করার উপযোগী করেই বইটি লেখা হয়েছে।

www.icsbook.info

জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব

সূরা আলাক ১-৫

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ-
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِا للّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ
اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ- خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ-
اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ- الَّذِىْ عَلَّمَ بِا لْقَلَمِ- عَلَّمَ الْاِنْسَانَ
مَا لَمْ يَعْلَمْ-

সরল অনুবাদ ঃ ইরশাদ হচ্ছেঃ (১) (হে মুহাম্মদ সঃ) তুমি পড়ো তোমার রবের নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। (২) যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট বাঁধা রক্ত থেকে। (৩) তুমি পড়ো, তোমার রব (তোমার উপর) বড়ই মেহেরবান। (৪) যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। (৫) শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ اِقْرَاْ-পড়ো। بِسْمِ-নামে। رَبِّكَ-তোমার রবের। اَلَّذِىْ-যিনি। خَلَقَ-সৃষ্টি করেছেন। اَلْاِنْسَانَ-মানুষকে। مِنْ-থেকে, হতে عَلَقٍ-জমাট রক্তপিন্ড। وَ-এবং, আর। اَلْاَكْرَمُ-বড়ই মেহেরবান বা দয়ালু। عَلَّمَ-শিক্ষা দিয়েছেন। بِالْقَلَمِ-কলমের সাহায্যে। مَا-যা। لَمْ-না। يَعْلَمْ-সে জানতো।

সম্বোধনঃ উপস্থিত সম্মানিত /প্রিয় / ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ভায়েরা/ বোনেরা! আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহ্‌মাতুল্লাহি অয়াবারাকাতুহ। আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কালামে হাকীম আল-কুরআনের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াতগুলো তেলাওয়াত ও সরল অনুবাদ পেশ করেছি। মহান

www.icsbook.info

রাব্বুল আলামীনের কাছে কামনা করছি, তিনি যেনো অত্র আয়াতগুলোর দারস সঠিকভাবে পেশ করার তৌফিক দান করেন। আমিন।

সূরার নামকরণঃ অত্র সূরার দ্বিতীয় আয়াতে উল্লেখিত علق (আলাক) শব্দকেই এই সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

"আলাক' মানে "জমাট রক্ত"। আলোচ্য বিষয়বস্তু হিসেবে যদিও সূরাটির নাম শিরোনাম হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি। তথাপিও এই সূরার মূল বিষয়ের সাথে নামের বেশ সম্পর্ক রয়েছে।

সূরাটি অবতীর্ণ হবার সময়কালঃ সূরাটি একই সময় নাযিল হয়নি। এর দুটি অংশ রয়েছে। প্রথম অংশ হলোঃ ১-৫ আয়াত। আর দ্বিতীয় অংশ হলো ৬ আয়াত থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত। সূরার প্রথম অংশ অর্থাৎ ১-৫ আয়াত নাযিলের ব্যাপারে সকল মুফাস্‌সীরগণ একমত হয়েছেন যে, এটাই হলো নবী করীম (সাঃ) এর উপর সর্বপ্রথম অহী, যা হেরা গুহায় অবতীর্ণ হয়েছিলো। আর তা ছিলো নবী করীম (সাঃ) এর ৪০ বছর বয়সে অর্থাৎ ৬১০ খৃষ্টাব্দে।

ইমাম আহমদ, বুখারী, মুসলিম এবং অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসকে বিশুদ্ধ হাদীস হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া হযরত ইবনে আব্বাস, আবু মুসা আশআরী (রাঃ) সহ বিপুল সংখ্যক সাহাবী হতেও এ কথাই বর্ণিত হয়েছে।

সূরার দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ ৬ থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত পরবর্তী সময় অবতীর্ণ হয়। নবী করীম (সাঃ) যখন কাবা ঘরে নামায পড়তে শুরু করেছিলেন, তখন আবু জেহেল ধমক দিয়ে এ কাজ হতে তাঁকে বিরত রাখতে চেষ্টা করেছিলো, ঠিক সেই সময়ই সূরার এই দ্বিতীয় অংশ অবতীর্ণ হয়।

সূরার মূল বিষয়বস্তু ঃ সূরাতে জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব তুলে ধরে অহীর জ্ঞান অর্থাৎ আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সাথে সাথে মানুষকে তাঁর সৃষ্টির হাকীকতের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। মানুষ যখন অভাব মুক্ত হয়ে যায় তখন সে স্বাভাবিক ভাবেই আল্লাহ্‌কে ভুলে গিয়ে বিদ্রোহী হয়ে যায়। এ ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত তাদেরকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে।

www.icsbook.info

তাছাড়া নবী করীম (সাঃ)কে নামাযে বাধাদানকারী আবু জেহেল সহ এ ধরনের আচরণকারীদের ধমক দিয়ে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। আর এটাও স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মানুষ যা কিছুই করুক না কেন, আল্লাহ্পাক সব কিছুই দর্শন করছেন।

ওহীর সূচনা ঃ বোখারী, মুসলিম ও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে প্রমাণিত রয়েছে এবং আগের ও পরের বেশীরভাগ আলেম এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, সূরা আলাক থেকেই ওহীর সূচনা হয় এবং এই সূরার প্রথম পাঁচ আয়াত مَا لَمْ يَعْلَمْ পর্যন্ত সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়।

ইমাম বোখারী (রঃ) তাঁর কেতাবে হযরত আয়েশা (রাঃ) এর হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ **হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ প্রথমে যে অহী** রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর কাছে আসতো তা হলো ঘুমের মধ্যে তাঁর সত্য স্বপ্ন। তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন তা ভোরের আলোর মতই স্পষ্ট হতো। এরপর তাঁর কাছে নিরিবিলি জীবন যাপন ভালো লাগলো। তাই তিনি একাধারে কয়েকদিন পর্যন্ত নিজ পরিবারের কাছে না গিয়ে হেরা গুহায় নির্জন পরিবেশে আল্লাহ্র ইবাদতে মগ্ন থাকতে লাগলেন। আর এ উদ্দেশ্যে তিনি কিছু খাবার সাথে নিয়ে যেতেন। পরে তিনি বিবি খাদিজা (রাঃ) এর কাছে ফিরে এসে আবার ঐরূপ কয়েকদিনের জন্য কিছু খাবার সাথে নিয়ে যেতেন। এভাবে হেরা গুহায় (এবাদতে) থাকা অবস্থায় তাঁর কাছে সত্য (অহী) এলো। জিবরীল ফেরেশ্তা সেখানে এসে তাঁকে বল-লেন ঃ

اِقْرَاْ (পড়ুন)। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেনঃ مَا اَنَا بِقَارِئٍ **আমি তো পড়তে পারি না।** রাসূল বলেনঃ ফিরিশ্তা তখন আমাকে বুকে (ঝাপটে) ধরে এতো জোরে চাপ দিলেন যে, এতে আমি বেশ কষ্ট পেলাম। এরপর ফেরেশ্তা আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন ঃ اِقْرَاْ- (পড়ুন)। আমি বললামঃ مَا اَنَا بِقَارِئٍ **আমি পড়তে পারি না।** তখন তিনি দ্বিতীয়বার আমাকে (বুকে) ধরে খুব জোরে চাপ দিলেন। তাতে আমার ভীষণ কষ্ট হলো। এরপর আমাকে ছেড়ে তিনি পড়তে বললেন।

www.icsbook.info

আমি বললাম ঃ مَا اَنَا بِقَارِئٍ আমি তো পড়তে পারি না। রাসূল বলেনঃ জিবরীল ফেরেশ্‌তা তৃতীয়বার আমাকে (বুকে) ঝাপটে ধরে এমন জোরে চাপ দিলেন যে, আমার প্রচন্ড কষ্ট হলো। এবার তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেনঃ

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ- خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ- اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ- اَلَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ- عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ-

পড়ো! তোমার রবের নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত থেকে। পড়ো! তোমার রব বড়ই দয়ালু। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন।মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানতো না।রাসূল(সঃ)এই আয়াত কয়টি আয়ত্ত করে বাড়ি ফিরলেন। তাঁর অন্তর তখন ভয়ে কাঁপছিলো। তিনি বিবি খাদিজা (রাঃ) এর কাছে এসে বললেনঃ **আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও। "আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও।** তিনি তাঁকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। পরে তাঁর ভয় চলে গেলে তিনি বিবি খাদিজা (রাঃ) এর কাছে সব ঘটনা বর্ণনা করে বললেনঃ আল্লাহ্‌র কসম! আমি আমার নিজের জীবন সম্পর্কে ভয় করছি। খাদিজা (রাঃ) সান্তনা দিয়ে বললেনঃ ভয় নাই। আল্লাহ্‌র কসম! তিনি কখনও আপনাকে অপমানিত করবেন না। তার কারণ আপনি আত্মীয়-স্বজনদের সাথে ভাল ব্যবহার করেন, দুর্বল ও দুঃখীদের খেদমত করেন, বঞ্চিত ও অভাবীদেরকে উপার্জনক্ষম করেন, মেহমানদারী করেন এবং বিপদগ্রস্থদেরকে সাহায্য করেন। অতঃপর খাদিজা (রাঃ) তাঁকে সাথে নিয়ে তাঁর চাচাত ভাই **'অরাকা বিন নওফেল'** এর কাছে গেলেন। অরাকা যাহেলী যুগে ঈসায়ী (খৃষ্টান) ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইবরাণী ভাষায় কিতাব লিখতেন। আরবী ও হিব্রু ভাষায় ইঞ্জিল লিখতেন। তিনি এই সময় খুব বেশী বৃদ্ধ ও অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। হযরত খাদিজা তাঁকে বললেন ঃ ভাইজান! আপনি আপনার ভাতিজার সব ঘটনা জানুন। 'অরাকা' তাঁর ভাতিজা অর্থাৎ রাসূলের কাছে সব ঘটনা

www.icsbook.info

শুনতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁকে সব ঘটনা বিস্তারিত ভাবে শুনালেন। ঘটনা শুনে অরাকা বললেনঃ এ সেই রহস্যময় নামুস (ওহী বহনকারী ফেরেশ্‌তা)। যাকে আল্লাহ্ পাক হযরত মূসা (আঃ) এর প্রতি নাযিল করেছিলেন। তিনি আবসুস করে বললেনঃ হায়! আমি যদি তোমার নবুয়তের সময় যুবক বয়সের হতাম! হায়!! আমি যদি সেই সময় বেঁচে থাকতাম, যখন তোমার জাতির লোকেরা তোমাকে মক্কা থেকে বের করে দেবে!! রাসূল (সাঃ) অরাকাকে জিজ্ঞেস করলেন, সত্যই কি তারা আমাকে বের করে দেবে ? অরাকা বললেনঃ হ্যাঁ, তুমি যা নিয়ে এসেছো, তদ্রুপ কোনো কিছু নিয়ে যে ব্যক্তিই এসেছে, তার সাথে শত্রুতাই করা হয়েছে। আমি তোমার যুগে বেঁচে থাকলে তোমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করবো। কিন্তু এর অল্পকাল পরেই অরাকা ইন্তেকাল করলেন এবং অহীও (তিন বছর পর্যন্ত) স্থগিত রইলো।

সর্বপ্রথম সূরা ঃ বোখারী, মুসলিম ও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে সকল ওলামায়েকেরাম একমত পোষণ করেন যে, সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াতের মাধ্যমেই অহীর সূচনা হয়। তবে প্রথম সূরা সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেউ কেউ সূরা **মুদ্দাস্‌সিরকে** প্রথম সূরা এবং কেউ কেউ সূরা **ফাতিহাকে** সর্বপ্রথম সূরা বলে মত প্রকাশ করেন। যারা সূরা **মুদ্দাস্‌সিরকে** প্রথম সূরা বলে মত প্রকাশ করেন, তাদের বক্তব্য হলো সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত নাযিলের পর দীর্ঘ তিন বছর অহী বন্ধ থাকে। এতে রাসূল (সাঃ) ভীষণ মানুষিক অশান্তির মধ্যে থাকেন। এর পর হঠাৎ করে জিবরাইল (আঃ) সামনে আসেন এবং সূরা মুদ্দাস্‌সির অবতীর্ণ হয়। এই সূরা নাযিলের সময় রাসূল (সাঃ) ভীষণ ঘাবড়িয়ে গিয়েছিলেন এবং ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। যেভাবে সূরা আ'লাকের প্রথম আয়াতগুলো নাযিলের সময় হয়েছিলেন। এভাবে অহী নাযিলের বিরতির পর সূরা মুদ্দাস্‌সিরের প্রথম দিকের আয়াতগুলো নাযিল হয়। ফলে একেও প্রথম সূরা বলে ধরে নেয়া যায়। সূরা ফাতিহাকে প্রথম সূরা বলার কারণ এই যে, পূর্ণ সূরা হিসেবে একত্রে সূরা ফাতিহাই সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়। এর আগে কয়েকটি সূরার অংশ বিশেষ অবতীর্ণ হয়েছিলো। (মাযহারী)।

www.icsbook.info

উপরোক্ত দলিলের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, সর্ব প্রথম আয়াত হলো সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত এবং সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ সূরা হলো সূরা ফাতিহা।

ব্যাখ্যাঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা আ'লাকের প্রাথমিক ধারণা পেশ করলাম। এখন আমি তেলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা পেশ করছি।

اِقْـرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ –**পড় (হে নবী!) তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন!** আয়াতে প্রথমতঃ আমভাবে اِقْـرَأْ পড় দ্বারা পড়ার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। আর اِسْمُ দিয়ে আল্লাহ্‌র নামের সাথে পড়তে বলা হয়েছে। যেই পড়ার শুরুতে বা মধ্যে আল্লাহ্ নেই, সেই পড়ার দ্বারা জ্ঞান অর্জন করাতে মানুষের কোন কল্যাণ নেই। কেননা, যারা অহীর জ্ঞানে জ্ঞানী কেবল তারাই আল্লাহ্‌কে বেশী ভয় করে থাকে, যেমন আল্লাহ্‌পাক বলেনঃ

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ط

নিশ্চয় বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই আল্লাহ্‌কে ভয় করে। (সূরা ফাতির-২৮)।

আল্লাহ্‌পাক সূরা যুমার এর ৯নং আয়াতে জ্ঞানী এবং মূর্খদের মধ্যে তুলনা করে বলেনঃ

هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ–

যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে? ঈমানদার জ্ঞানীদের মর্যাদার কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্‌পাক বলেনঃ

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ–

তোমাদের মধ্যে যারা ইমানদার এবং জ্ঞানী আল্লাহ্ তাদের মর্যাদা উঁচ করে দিয়েছেন। (সূরা মুজাদালাহ্ -১১)

www.icsbook.info

দ্বিতীয়তঃ اِقْرَأْ পড় দ্বারা খাসভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর উপর অহীর সুচনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ভূমিকায় অহীর সূচনায় উল্লেখ করেছি, হেরা গুহায় ফেরেশ্‌তা জিবরাইল (আঃ) যখন নবী করীম (সাঃ) কে বল-লেন, اِقْرَأْ **পড়** তখন তিনি জবাবে বললেনঃ مَا اَنَا بِقَارِئٍ **আমি তো পড়তে পারি না** এটা হতে জানা যায় যে, অহীর এই শব্দগুলো লি-খিত আকারে তাঁর সামনে পেশ করা হয়েছিলো এবং সেই লিখিত জিনিসই পড়তে বলা হয়েছিলো। কেননা, ফেরেশ্‌তার কথার অর্থ যদি এই হতো যে, আমি যেভাবে বলতে থাকি আপনিও সেই ভাবে পড়তে থাকুন, তা হলে ভার উত্তরে নবী করীম (সাঃ)কে 'আমি পড়তে পারি না' বলতে হতো না। তার কারণ হলো লিখিত জিনিস পড়তে না পারলেও কারও উচ্চারণকে অনুসরণ করে তার মতো উচ্চারণ করা যে কোনো র্মুখ লোকের পক্ষেও সম্ভব।

রাসূলকে উম্মী বা নিরক্ষর বানানোর হাকীকতঃ উম্মী বা নিরক্ষর ব্যক্তিকে রাসূল বানানোর হাকীকত এই হতে পারে যে, যদি লেখা-পড়া জানা ব্যক্তির উপর অহী অর্থাৎ আল-কুরআন নাযিল হতো, তাহলে তৎকালীন এবং পরবর্তী যুগের কাফের এবং খোদাদ্রোহী শক্তি কুরআনকে নবী লিখিত কেতাব বলে অভিযোগ দেয়ার সুযোগ পেত। ফলে দুর্বল-চেতা মানুষেরা এই কথায় বিশ্বাস করে ফেলতো বা সন্দেহ সংশয়ের মধ্যে পড়ে বিভ্রান্ত হয়ে যেতো। আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে সেই সুযোগ না দেবার জন্যই একজন নিরক্ষর ব্যক্তির উপর পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা আল-কুরআন নাযিল করেন। এতো কিছুর পরেও কাফেরেরা রাসূল (সাঃ)কে 'সায়ের' (কবি) 'কাহেন' (যাদুকর) এবং 'মাজনুন' (পাগল) বলে আখ্যায়িত করেছিলো। কিন্তু তাদের এই উক্তির প্রতিউত্তরও আল্লাহ্ তাআলা সাথে সাথে দিয়ে দিয়েছিলেন। যার কারণে তাদের এই উক্তি সমাজে টিকে নাই।

জানার বিষয় হলো এই যে, রাসূল (সাঃ) উম্মী ছিলেন, লেখা-পড়া জানতেন না। কিন্তু তাঁকে আল্লাহ্পাক এত জ্ঞান ও পান্ডিত্য দান করেছিলেন যে, তাঁর সামনে বড় বড় পন্ডিত ব্যক্তিরাও হার মানতে বাধ্য

www.icsbook.info

হয়েছিলো। মহানবী (সাঃ) এর পান্ডিত্য, নেতৃত্ব এবং উত্তম আদর্শের কারণে আধুনিক বিশ্বেও তাঁকে সেরা ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। বিশ্বের সর্বোচ্চ শিক্ষাকেন্দ্র "অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটির" কর্তা ব্যক্তিরা সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান গেটের নাম ফলকে পৃথিবীর একশো জন সেরা ব্যক্তিদের নামের তালিকায় লিখা সর্বপ্রথম এবং সর্বউচ্চে মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর নামটি আজও উজ্জ্বল অক্ষরে জলজল করছে।

بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ **তোমার রব এর নামে পড়**। এই হতে এ কথাও জানা যায় যে, নবী করীম (সাঃ) অহী নাযিলের মাধ্যমে নবুয়াত লাভের পূর্বেও আল্লাহ্‌কে রব হিসেবে জানতেন এবং মানতেন। যার কারণে সরাসরি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়াই বলা হয়েছে **তোমার রব এর নাম নিয়ে পড়**।

خَلَقَ **যিনি সৃষ্টি করেছেন**। এখান থেকে রব বা প্রতিপালকের কতিপয় গুনাবলী যা মানুষের জন্য নেয়ামত, তা বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র গুণাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে সৃষ্টিগুণ উল্লেখ করার মধ্যে সম্ভবতঃ রহস্য এই যে, সৃষ্টি তথা অস্তিত্ব দান করাই সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ্ তাআলার সর্বপ্রথম নেয়ামত বা অনুগ্রহ। এই خَلَقَ দ্বারা ব্যাপক অর্থের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ গোটা বিশ্ব জগতকে বোঝানো হয়েছে।

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ **মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট বাঁধা রক্ত পিন্ড থেকে**। আগের আয়াতে সাধারণভাবে গোটা বিশ্ব জগতের সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ আয়াতে বিশেষভাবে সৃষ্টির সেরা জীব মানুষের সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যায়, গোটা বিশ্ব জগতের সার নির্যাস হচ্ছে মানুষ। জগতে যা কিছু আছে তার প্রত্যেকটির নযীর মানুষের মধ্যে আছে। তাই মানুষকে ক্ষুদ্র জগৎ বলা হয়। বিশেষভাবে মানুষ উল্লেখ করার এক কারণ এও হতে পারে যে, নবী-রাসূল ও কুরআন অবতীর্ণ করার লক্ষ্য হলো আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ পালন করানো। আর এই কাজটি বিশেষভাবে মানুষেরই। তাই এই আয়াতে মানুষের সৃষ্টির কথা খাসভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

www.icsbook.info

عَلَقٍ-বহুবচন। একবচন- عَلَقَةٌ-এর অর্থ জমাট বা দলা বাধা রক্ত।

মায়ের পেটে সন্তান ধারণ করার পর প্রাথমিক কয়েক দিনের মধ্যে এরূপ অবস্থা হয়। মায়ের গর্ভে মানুষ সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর বোখারী শরীফের এক হাদীসে আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের বর্ণনায় মহানবী (সাঃ) বলেনঃ মানুষের বীর্য ৪০দিন পর্যন্ত গর্ভাশয়ে জমা থাকে। ৪০ দিন পর তা জমাট রক্তে পরিণত হয়। এরপর আরও ৪০ দিন অতিবাহিত হলে তা মাংসপিন্ড হয়ে যায়। অতপরঃ (হাড়-হাড্ডি সহ মানুষের আকার-আকৃতি সৃষ্টি করে) তাতে আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে একজন ফেরেশ্তা পাঠানো হয়। সে তাতে রূহ ফুঁকে দেয়। عَلَقٍ-বা জমাট রক্তপিন্ড হচ্ছে মানুষ সৃষ্টির মধ্যবর্তী অবস্থা। আয়াতে এই মধ্যবর্তী অবস্থা উল্লেখের মাধ্যমে এর আগের ও পরের অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত হয়ে গেছে। অতঃপর আল্লাহ্পাক পুনরায় পড়ার নির্দেশ দিয়ে বলেনঃ

اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ পড়, তোমার রব বড়ই দয়ালু। এখানে اِقْرَاْ আদেশের পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয়বার এটা উল্লেখ করার কারণ এরূপও হতে পারে যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পাঠ করার জন্যে প্রথম اِقْرَاْ বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় اِقْرَاْ-দাওয়াত, তাবলীগ বা প্রচার ও অন্যদেরকে পড়ানোর জন্য বলা হয়েছে। সুতরাং এই اِقْرَاْ দ্বারা গোটা মানব জাতিকে পড়ার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের কথা বলা হয়েছে। এই কাজ আল্লাহ্র নবী (সাঃ) বাস্তবে রূপ দিয়েছিলেন তার প্রমাণ আল্লাহ্পাক সূরা আল জুমুআতে উল্লেখ করেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ

তিনিই আল্লাহ্! নিরক্ষরদের মধ্যে থেকেই একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কেতাব ও হিকমত। (সূরা জুমুআ-২)

الْأَكْرَمُ-ইহা একটি আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ গুণ। এই বিশেষ গুণের মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, জগৎ এবং মানুষ সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ্ তাআলার নিজের কোনো স্বার্থ এবং লাভ নেই। বরং এগুলো সব দয়ার বা দানের কারণে করা হয়েছে। ফলে জগৎ এবং মানুষের এই অস্তিত্বের সৃষ্টি আল্লাহ্পাকের এক বিশেষ নেয়ামত এবং দান। অতঃপর আল্লাহপাক বলেনঃ

الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষাদান করেছেন।

এটাও একটি আল্লাহ্পাকের বিশেষ গুণ এবং মানুষের জন্য এক বড় নেয়ামত। মানুষ সৃষ্টির পর মানুষের শিক্ষা-দীক্ষার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, শিক্ষাই মানুষকে অন্যান্য জীবজন্তু থেকে পৃথক এবং **আশরাফুল মাখলুকাত** বা সৃষ্টির সেরা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এটা সৃষ্টি জগতের মধ্যে খাস করে মানুষের জন্য আল্লাহ্ তাআলার এক বিশেষ অবদান, এক অতি বড় নেয়ামত বা অনুগ্রহ।

শিক্ষার মাধ্যম ঃ শিক্ষার মাধ্যম সাধারণতঃ দু'টি। (১) মৌখিক শিক্ষা। (২) কলম বা লেখার মাধ্যমে শিক্ষা। সূরার শুরুতে اِقْرَأْ শব্দের মধ্যে মৌখিক শিক্ষা রয়েছে। আর এ আয়াতে কলমের সাহায্যে শিক্ষাকে বোঝানো হয়েছে।

শিক্ষার প্রথম উপকরণ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ **আল্লাহ্পাক যখন আদিকালে সবকিছু সৃষ্টি করেন, তখন আরশে তাঁর কাছে সংরক্ষিত কেতাবে একথা লিখেন যে, আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর প্রবল থাকবে।** হাদীসে আরও বলা হয়েছে ঃ **আল্লাহ্ তাআলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেন এবং তাকে লেখার নির্দেশ দেন। সেমতে কলম কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে সব লিখে ফেলে। এ (লিখিত) কেতাব আল্লাহ্র নিকট আরশে সংরক্ষিত আছে। (কুরতুবী)।**

আল্লাহ্পাক মানুষকে কেবল জ্ঞান ও বিবেকে সম্পন্ন করেই ক্ষান্ত হননি। বরং তিনি মানুষকে কলমের সাহায্যে লেখার কৌশল, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রচার, প্রসার ও উন্নয়ন এবং বংশ পরম্পরাই জ্ঞানের

উত্তরাধিকারী সৃষ্টি ও বিকাশ, স্থায়িত্ব ও সংরক্ষণের মাধ্যম বানিয়েছেন। আল্লাহ্পাক মানুষকে যদি কলমের ব্যবহার এবং কলমের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা না করতেন, তাহলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়ন এবং স্থায়িত্ব লাভ করা সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব হয়ে পড়তো। তাইতো মানুষ আজ আল্লাহ্ প্রদত্ত এই কলমের সাহায্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে উর্দ্ধ থেকে আরও উর্দ্ধে, যমীনের নীচ থেকে আরও নীচে এবং গভীর পানির তলদেশ থেকে আল্লাহ্র সৃষ্টি রহস্য উৎঘাটনের জন্য আত্মনিয়োগ করেছে। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে অনেক অজানাকে জানা এবং দূরের জিনিসকে নিকট থেকে আরও নিকটতর করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অতপরঃ আল্লাহ পাক পরবর্তী আয়াতে বলেনঃ

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ **শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না।**

মূলতঃ মানুষ মুর্খ, জ্ঞানহীন। কোনো বিষয়ে তার কোনো জ্ঞান নেই। সে যদি কিছু জানে বা কোনো বিষয়ে তার জ্ঞান থেকে থাকে তবে তা একান্তভাবে আল্লাহ্রই দান। আল্লাহ্-ই সেই জ্ঞান দান করেছেন। মুখে এবং কলমের সাহায্যে যে শিক্ষা দিয়েছেন তা দুনিয়ার জীবনে দিয়েছেন এবং তা অর্জনের জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টারও প্রয়োজন আছে। কিন্তু আল্লাহ্ মানুষকে খেলাফতের দায়িত্ব দিয়ে পৃথিবীতে পাঠানোর পূর্বেই যখন আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করলেন, তখন তার কোনো জ্ঞান ছিলো না। খেলাফতের দায়িত্ব পালনের উপযোগী এবং **আশরাফুল মাখলুকাত** বা সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানের জন্য আল্লাহ্পাক ফেরেশ্তাদেরকে আনুগত্য প্রকাশের নির্দেশ দেবার আগেই তাঁকে দুনিয়ার সমস্ত জ্ঞান দিয়ে সমৃদ্ধ করলেন। সূরা বাকারার ৩১ নম্বর আয়াতে তা উল্লেখ করে বলেনঃ

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا **আল্লাহ্ আদমকে দুনিয়ার সমস্ত জিনিসের নাম শিক্ষা দিলেন।** এই জ্ঞান হলো মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের জ্ঞান,

www.icsbook.info

যা আল্লাহ্‌পাক প্রতিটি মানুষের মাঝে দান করেছেন। এই জ্ঞান হলো আল্লাহ্ প্রদত্ত সুপ্ত জ্ঞান। এই সুপ্ত জ্ঞানকে প্রকাশিত, প্রসারিত এবং উদ্ভাসিত করার জন্যই বৈষয়িক জ্ঞান পড়া-লেখার প্রয়োজন হয়। তবে এই জ্ঞান আল্লাহ্‌ই দিয়ে থাকেন যতটুকু তিনি মানুষকে দেওয়া সমিচীন মনে করেন। আয়াতুল কুরসীতে এ কথাটি এই ভাষায় বলা হয়েছেঃ

وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَاءَ

এই লোকেরা তাঁর (আল্লাহ্‌র)জ্ঞান ভান্ডার থেকে কোনো কিছুই আয়ত্ব করতে পারে না-ততটুকু ছাড়া, যতটুকু তিনি নিজে চান (সূরা বাকারা-২৫৫)। মানুষ যেসব জ্ঞান-বিজ্ঞানকে উদ্ভাবন বা আবিস্কার মনে করে, আসলে আগে তা তার জ্ঞানের আওতার মধ্যে ছিলো না। আল্লাহ্‌ই যখন চেয়েছেন, তখন সেই জ্ঞান থেকে তাকে দান করেছেন। যদিও মানুষ অনুভব করে না যে, এই জ্ঞান তাকে আল্লাহই দান করেছেন। এই জ্ঞান হলো মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিশেষ নেয়ামত বা অনুগ্রহ।

প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এ পর্যন্ত আয়াত পাঁচটি নবী করীম (সাঃ) এর উপর সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছিলো। অহী নাযিল হওয়ার এই প্রথম অভিজ্ঞতা রাসূলে করীম (সাঃ) এর পক্ষে বড়ই কঠিন, দুঃসহ ও কষ্টদায়ক ছিলো। এর বেশী সহ্য করা বা নিজের মধ্যে ধারণ করা তার পক্ষে মোটেই সম্ভব ছিলো না। এই কারণে এই প্রথম অহীর দ্বারা শুধু এতটুকুই জানিয়ে দেয়া যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। (এর পর প্রায় তিন বছর ওহী বন্ধ ছিলো)।

শিক্ষা ঃ সম্মানিত ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াতের যে ব্যাখ্যা পেশ করলাম, এর মাধ্য-মে আমাদের জন্য যেসব শিক্ষা রয়েছে, তা হলো ঃ

❒ আমরা যখন কুরআন তিলাওয়াত করবো তখন আল্লাহ্‌র নাম বিস্‌মিল্লাহ্ দিয়েই তিলাওয়াত করা শুরু করবো। শুধু তিলাওয়াতই নয় বরং যে কোনো কাজ বিসমিল্লাহ্ দিয়েই শুরু করবো।

❒ অহীর জ্ঞান তথা আল-কুরআনের জ্ঞান অর্জন করার জন্য আত্মনিয়োগ করতে হবে। তার কারণ, যতো বেশী কুরআনের জ্ঞান সৃষ্টি হবে ততো বেশী মানুষের মধ্যে আল্লাহ্র ভয় এবং ভক্তি সৃষ্টি হবে।

❒ সমস্ত জগত মানুষের কল্যাণের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং এই বিশেষ দানের জন্য আমরা আল্লাহ্র কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে যাবো।

❒ বিশেষ ভাবে মানুষ সৃষ্টির কথা উল্লেখের মাধ্যমে আল্লাহ্পাক এখানে মানুষের বিশেষত্ব তুলে ধরছেন। সুতরাং মানুষের উচিৎ হবে, আল্লাহ্র ইবাদত-বন্দেগীতে আত্মনিয়োগ করা।

❒ আল্লাহ্র দয়া-মায়া, এবং অনুগ্র লাভের জন্য মানুষের উচিত পড়া এবং লেখার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করে খেলাফতের সঠিক দায়িত্ব আন্জাম দেয়া।

❒ মানুষ কিছুই জানতো না। আল্লাহ্ই মানুষকে তার বিশেষ মেহেরবানী করে শিক্ষা দিয়েছেন, একথা মানুষকে সব সময় স্মরণ রাখতে হবে। একথা মনে করতে হবে যে, আমি যা শিখেছি তা আল্লাহ্ পাকের বিশেষ মেহেরবাণীতেই শিখেছি। কেননা জ্ঞান অর্জন আল্লাহ্র বিশেষ দান।

আহবান ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াতের যে ব্যাখ্যা এবং শিক্ষা পেশ করলাম, এতে যদি আমার অজান্তে কোনো ভুল-ত্রুটি হয়ে যায়, তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আর দারস থেকে যে সব শিক্ষা আমরা লাভ করলাম, তা যেনো বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারি, সেই তৌফিক কামনা করে আমি আমার দারস শেষ করছি। **অয়াআখেরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন।**

www.icsbook.info

দুই

মুমিনের জিন্দেগী হবে তাকওয়া,আন্দোলন ও দাওয়াতী জিন্দেগী

সূরা আলে-ঈমরান-১০২-১০৪

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِا للّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُو اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ۰
اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ- وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا
وَّلَا تَفَرَّقُوْا - وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْكُنْتُمْ اَعْدَاءً
فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْ بِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا-
وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَ كُمْ مِّنْهَاؕ كَذٰ
لِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰ يٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ- وَلْتَكُنْ
مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ-۰

সরল অনুবাদঃ ইরশাদ হচ্ছে (১০২) হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো, যেমন করে ভয় করা উচিত। আর (প্রকৃত) মুস-লমান না হয়ে তোমরা মৃত্যুবরণ করো না। (১০৩) তোমরা সবাই মিলে আল্লাহ্‌র রজ্জু (দ্বীন)-কে শক্ত হাতে ধারণ করো; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যেও না। আর তোমরা আল্লাহ্ তাআলার সেই অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো যা তোমাদেরকে তিনি দান করেছেন। (তা হলো) তোমরা একে অপরের দুষমন ছিলে, অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদের দেলের মধ্যে ভালোবাসা পয়দা করে দিয়েছেন। ফলে এখন তোমরা তাঁর দয়ায়

www.icsbook.info

পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেছ। তোমরা তো এক আগুনের কুন্ডলীর পাড়ে অবস্থান করছিলে। অতঃপর তিনি (মেহেরবাণী করে) সেখান থেকে তোমাদেরকে উদ্ধার করেছেন। এভাবেই আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেন। যাতে তোমরা হেদায়েত লাভ করতে পারো। (১০৪) আর তোমাদের মধ্যে (সদাসর্বদা) এমনএকটা দল বা সংগঠন থাকা দরকার, যারা সৎ কাজের দিকে মানুষকে ডাকবে, ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে। (প্রকৃতপক্ষে) তারাই হলো সফলকাম।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থঃ يَاَيُّهَا–ওহে। اَلَّذِيْنَ–যারা। اِتَّقُوْ–তোমরা ভয় করো। حَقَّ–অধিকার, যথাযথ। تُقٰتِهٖ–তাঁর ভয়। وَ–এবং। لَا–না। تَمُوْتُنَّ–তোমরা মরো। اِلَّا–ছাড়া, ব্যতীত। وَاَنْتُمْ–তোমরা। وَاعْتَصِمُوْ–তোমরা শক্তভাবে ধরো। حَبْلِ–-রশি (দ্বীন) جَمِيْعًا–দলবদ্ধ বা সংগঠিতভাবে। لَا تَفَرَّقُوْا–তোমরা পৃথক হয়ে যেও না। وَاذْكُرُوْ–এবং তোমরা স্মরণ করো। عَلَيْكُمْ–তোমাদের উপর। اِذْ–যখন। كُنْتُمْ–তোমরা ছিলে। عَلٰى–-উপর। شَفَا–কিনারা বা প্রান্তর। حُفْرَةٍ–কুন্ডলী বা গর্ত। اَلنَّارِ–আগুন। فَاَنْقَذَكُمْ– অতঃপর তোমাদেরকে উদ্ধার করলেন বা পরিত্রাণ দিলেন। مِنْهَا– সেখান থেকে। كَذٰلِكَ–এভাবে। اَللّٰهُ يُبَيِّنُ–আল্লাহ্ প্রকাশ বা বর্ণনা করেন। لَكُمْ–তোমাদের জন্য। اٰيٰتِهٖ–তাঁর নিদর্শনসমূহ। لَعَلَّكُمْ-যাতে তোমরা। تَهْتَدُوْنَ–তোমরা সঠিক পথ পাও। وَلْتَكُنْ–এবং অবশ্যই থাকা উচিত। مِنْكُمْ–তোমাদের মধ্যে। اُمَّةٌ–জাতি বা দল। يَدْعُوْنَ–তারা ডাকে বা আহবান করে। اِلٰى–দিকে বা প্রতি। اَلْخَيْرِ–উত্তম। يَاْمُرُوْنَ–তারা আদেশ করবে। بِا– সহিত। مَعْرُوْفِ– ভালো বা উত্তম। وَيَنْهَوْنَ–তারা বারণ করবে বা নিষেধ করবে। عَنْ–থেকে বা হতে। اَلْمُنْكَرْ–মন্দ বা অপছন্দনীয়। وَاُولٰئِكَ–এবং ওরাই। هُمْ– তারাই। الْمُفْلِحُوْنَ–সফলকাম।

www.icsbook.info

সম্বোধনঃ প্রিয় ভায়েরা/ বোনেরা! আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্। আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কালামে হাকীম আল-কুরআনের সূরা আলে ঈমরানের ১০২-১০৪ পর্যন্ত মোট ৩টি আয়াত তিলাওয়াত ও সরল তরজমা পেশ করেছি। আল্লাহ্ পাক যেনো আমাকে আপনাদের উপস্থিতিতে দারসের জন্য তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা এবং শিক্ষা তুলে ধরার তৌফিক দান করেন। "অমা তাওফীকি ইল্লাহ বিল্লাহ্।"

সূরার নামকরণঃ এই সূরার ৩৩ নং আয়াতে উল্লেখিত وَاٰلَ عِمْرٰنَ এই শব্দকে কেন্দ্র করে এর নামকরণ সূরা **আলে ঈমরান** করা হয়েছে। সূরার নামকরণ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য এক নম্বর দারসে উল্লেখ করা হয়েছে।

সূরাটি নাযিলের সময়কালঃ সূরা আলে ঈমরান একই সময় একই ভাষণে নাযিল হয়নি। কয়েকটি ভাষণে সূরাটি নাযিল হয়েছে। তা হলোঃ

● প্রথম ভাষণটি সূরার প্রথম থেকে শুরু হয়ে ৪র্থ রুকুর প্রথম দু'আয়াত অর্থাৎ ৩২ নম্বর আয়াত পর্যন্ত চলেছে। আর এটা সম্ভবতঃ বদর যুদ্ধের কাছাকাছি সময়ে নাযিল হয়।

● দ্বিতীয় ভাষণটি ৪র্থ রুকুর ৩৩ নম্বর আয়াত থেকে শুরু হয়ে ষষ্ঠ রুকুর শেষ পর্যন্ত চলেছে। ৯ম হিজরীতে নাজরানের প্রতিনিধি দল রাসূলের কাছে আগমনের সময় এটা নাযিল হয়।

● তৃতীয় ভাষণটি ৭ম রুকুর শুরু থেকে নিয়ে ১২তম রুকুর শেষ পর্যন্ত চলেছে। প্রথম ভাষণের সাথে সাথেই অর্থাৎ বদর যুদ্ধের কাছাকাছি সময়ে নাযিল হয় বলে ধারণা হয়।

● চতুর্থ ভাষণটি ১৩তম রুকু থেকে শুরু করে সূরার শেষ পর্যন্ত চলেছে। ওহুদ যুদ্ধের পর এটা নাযিল হয়।

বিষয়বস্তুঃ এই সূরায় দুটো দলকে সম্বোধন করে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। এক দল হলো আহলে কিতাব অর্থাৎ ইহুদী ও কৃষ্টান এবং দ্বিতীয় দলটি হলো ঈমানদার, রাসূলের সংগী-সাথীরা।

সূরা বাকারায় ইসলামের বাণী প্রচারের যে ধারা শুরু হয়েছিলো এই সূরায় প্রথম দলটির কাছে সে একই ধারায় প্রচার আরো জোরালো করা

হয়েছে। তাদের আকীদার বিভ্রান্তি ও চারিত্রিক দুষ্কর্ম সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এই রাসূল (সাঃ) এবং এই কুরআন এমন এক দ্বীনের দিকে নিয়ে আসে, যা এর আগের সকল নবীই এরই দিকে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে এসেছেন। আর সেটা হলো আল্লাহ্‌র প্রকৃত সত্য দ্বীন। সুতরাং তোমরা এই সত্য দ্বীনের সোজাপথ ছেড়ে যে পথ ধরেছো এটা সঠিক পথ নয়। আর তোমরা কুরআনকে বাদ দিয়ে অন্যান্যগুলো আসমানী কিতাব বলে স্বীকার করো এটাও সঠিক নয়। কাজেই তোমরা যার সত্যতা নিজেরা অস্বীকার করতে পার না তার সত্যতা স্বীকার করে নাও।

দ্বিতীয় দলটি শ্রেষ্ঠতম দলের মর্যাদা লাভ করার কারণে তাকে সত্যের পতাকাবাহী ও বিশ্ব মানবতার সংস্কার ও সংশোধনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে সূরা বাকারায় যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো এখানে তা আরো বৃদ্ধি করা হয়েছে। পূর্বের উম্মতদের ধর্মীয় ও চারিত্রিক অধঃপতনের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরে তাদেরকে তার অনুসরণ করা হতে দূরে থাকার জন্য সতর্ক করা হয়েছে। একটি সংস্কারবাদী দল হিসেবে তারা কিভাবে কাজ করবে এবং যেসব আহলে কিতাব (ইহুদী নাসরা) ও মুনাফিক মুসলমান আল্লাহ্‌র পথে নানা ভাবে বাধা বিপত্তি সৃষ্টি করছে, তাদের সাথে কি ধরনের আচরণ করবে, তাও তাদেরকে জানানো হয়েছে। ওহুদ যুদ্ধে তাদের মধ্যে যেসব দুর্বলতা দেখা দিয়েছিলো এই সূরায় পর্যালোচনা করে তা দূর করার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের বিষয়বস্তুঃ দারসের জন্য তিলাওয়াতকৃত আয়াত তিনটিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। তার মধ্যে দু'টি হলো ইসলামী জীবনের কেন্দ্রীয় চরিত্র। দু'টি মুসলমানদের জাতীয় শক্তির ভিত্তি। আর একটি হলো মুসলমানদের সামষ্টিক কল্যাণ।

ইসলামী জীবনের কেন্দ্রীয় চরিত্রের প্রথমটি হলো 'ঈমান' আর দ্বিতীয়টি হলো 'ভ্রাতৃত্ব'। যার উপর মুসলিম জাতি দাঁড়িয়ে আছে।

মুসলমানদের জাতীয় শক্তির উৎসের প্রথমটি হলো 'তাকওয়া' আর দ্বিতীয়টি হলো 'ঐক্যবদ্ধ জীবন বা জামায়াতী জিন্দেগী।'

মুসলমানদের সামষ্টিক কল্যাণ হলো 'দাওয়াত' ও 'তাবলীগ' বা প্রচার।

www.icsbook.info

ব্যাখ্যাঃ উপস্থিত প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত সূরা আলে ঈমরান এর তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর প্রয়োজনীয় বিবরণ দেবার পর এখন আপনাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ও আয়াতের ব্যাখ্যা পেশ করছি।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো, যেমন করে ভয় করা উচিত। আর প্রকৃত মুসলমান না হয়ে মৃত্যু বরণ করো না।

اِيْمَانٌ-(ঈমান) ঃ اِيْمَانٌ-শব্দটি اَمْنٌ-ধাতু থেকে লওয়া হয়েছে। যার অর্থ 'নিরাপত্তালাভ'। সাধারণ অর্থে 'বিশ্বাস'। মুসলমান হবার জন্য প্রথম শর্ত হলো ঈমান। ইসলামের যাবতীয় ইবাদাত এবং সৎ কাজের বুনিয়াদ হচ্ছে ইমান বা বিশ্বাস। ঈমান ছাড়া কোনো আমল তা দেখতে যতই নেক মনে হোক না কেন, তা আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এটা হলো ইসলামী জীবন যাপনের কেন্দ্রীয় প্রথম চরিত্র। সুতরাং যাদের মধ্যে ঈমান আছে তাদেরকেই এই আয়াতে اٰمَنُوْا-অর্থাৎ ঈমানদার বলে সম্বোধন করেছে।

اِتَّقُوا اللّٰهَ-**তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো।** تَقْوٰى-(তাকওয়া) শব্দটি وِقَايَةٌ-(বিকায়া) থেকে উৎপত্তি হয়েছে। যার অর্থ বেঁচে থাকা, বিরত থাকা, দূরে থাকা ও ভয় করা ইত্যাদি বোঝায়। সাধারণ অর্থে আল্লাহ্ভীতিকে তাক্ওয়া বলে। ফারসী ভাষায় তাকওয়াকে পরহেযগারী বলা হয়।

ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় তাক্ওয়া অর্থ হলো-ইসলাম যেসব বিষয়ে চিন্তা করতে, বলতে ও করতে নিষেধ করেছে, কেবলমাত্র আল্লাহ্ তাআলার ভয়ে সে সব চিন্তা-ভাবনা, কথা-বার্তা ও কাজ-কাম করা থেকে বিরত থেকে দ্বীন ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা-তদবীর করাকেই তাক্ওয়া বলা হয়। যারা এ গুনের অধিকারী হন তাদেরকে 'মুত্তাকীন' বা পরহেযগার বলা হয়।

তাক্ওয়া সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাঃ আমাদের সমাজে অধিকাংশের মধ্যে ইসলামের সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে তাক্ওয়া বা পরহেযগারী সম্পর্কে ধারণা হলো বাহ্যিক বেশ-ভূষা। যার মুখে লম্বা দাড়ি, মাথায় পাগড়ী, হাতে তাস্বীহ্ এবং গায়ে লম্বা জামা থাকে তাকেই মুত্তাকী বা পরহেযগার বলে মনে করে। অথচ শরীয়ত তাক্ওয়ার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বাহ্যিক দিকের প্রতি তেমন গুরুত্ব দেয়নি। প্রকৃতপক্ষে তাক্ওয়া হলো মনের মধ্যে আল্লাহ্র ভয়। আল্লাহ্র নবী (সাঃ) সাহাবীদের সামনে অক্ওয়া সম্পর্কে বক্তব্য দিতে গিয়ে তাঁর নিজের বুকের (কলবের) দিকে হাতের ইশারা দিয়ে তিন তিনবার বললেনঃ اَلتَّقْوَاىُ هَا هُنَا

তাক্ওয়া হলো এখানে (বুকের মধ্যে)। অর্থাৎ অন্তরে যদি আল্লাহ্র ভয় পয়দা হয়ে যায় তাহলে তার প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে এবং আমলে তার প্রভাব পড়ে। এ সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) বলেনঃ

اَلاَ اُنَبِّئُكُمْ بِخِيَارِكُمْ قَالُوْا بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ خِيَارُكُمُ الَّذِيْنَ اِذَا رُءُوْا ذُكِرَ اللّٰهُ وَاذْكُرَ اللّٰهَ

আমি কি তোমাদের উত্তম লোকদের সম্পর্কে বলবো ? সাহাবীরা বল-লেনঃ জি হ্যাঁ বলুন হে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ)। তিনি বললেনঃ তোমাদের মধ্যে তারাই উত্তম যাদের (আমল) দেখলে আল্লাহ্র কথা স্মরণ হয়। (অর্থাৎ অন্তরের তাক্ওয়ার কারণে বাহ্যিক দিকও তাক্ওয়ার প্রভাব ফুটে উঠে)। (ইবনে মাযা, রাবী আস্মা বিনতে ইয়াজীদ)।

তাক্ওয়ার একটি বাস্তব নমুনাঃ তাক্ওয়া সম্পর্কে প্রচলিত একটি ঘটনা আছে। তা হলো, একজন আলেম ওস্তাদ তাঁর কতিপয় ছাত্রের হাতে একটি চাকু ও একটি করে মুরগী দিয়ে বললেনঃ তোমরা মাঠের এমন এক নির্জন স্থান থেকে একে যবাই করে নিয়ে আসবে যেখানে কেউ দেখবে না। সেই ছাত্ররা ওস্তাদের কথা মতো হাতে চাকু এবং মুরগী নিয়ে মাঠের মধ্যে চললো এবং নির্জন মাঠের মধ্যে গিয়ে সবাই জবাই করে নিয়ে আসলো। কিন্তু একজন ছাত্র আস্ত মুরগী এবং চাকুটি হুজুরের কাছে ফেরত দিলো। এতে ওস্তাদ সেই ছাত্রটিকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি

তো মুরগী যবাই করোনি ? প্রতিউত্তরে ছাত্রটি বললো, হুজুর আপনি মুরগী যবাই করার সাথে একটি শর্ত জুড়ে দিয়েছিলেন, তা হলো-**কেউ যেনো না দেখে**। কিন্তু আমি মাঠের নির্জন থেকে নির্জন স্থানে যেখানেই যবাই করতে যাই, সেখানেই কোনো মানুষ না দেখলেও মহা শক্তিধর আল্লাহ্পাক আমার এই কাজটি দেখছেন। তাই আমি আর যবাই না করে আপনার শর্ত অনুযায়ী আস্ত মুরগী ফেরৎ নিয়ে এসেছি। প্রিয় ভায়েরা, এটাই তো হলো তাক্ওয়া বা খোদাভীতির বাস্তব নমুনা। তার কারণ মানুষ যে অবস্থায় যেখানেই থাকুক না কেনো, আর মনের মধ্যে যাই থাকনা কেনো, সবকিছুই পরখ করছেন মহান সেই আল্লাহ্ তাআলা।

তাক্ওয়া হচ্ছে এমন একটি মৌলিক গুণ যার উপর গোটা মুসলিম জামায়াত টিকে আছে এবং তাদের প্রতিদিনের কর্তব্য পালন করে যাচ্ছে। তাক্ওয়ার এই গুণটির অভাবে একটি সমাজ জাহেলী সমাজে পরিণত হয়। মানুষের মধ্যে কোনো সৎ নেতৃত্ব গড়ে উঠতে পারে না। এ গুণটি যেই নেতৃত্বের মধ্যে নেই সেই নেতৃত্ব যত বলিষ্ঠ নেতৃত্বই হোক না কোনো, তা হবে জাহেলী নেতৃত্ব, যা সাধারণ মানুষের জন্য কোনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না।

আয়াতে উল্লেখিত ইসলামের কেন্দ্রীয় চরিত্র ঈমান এবং জাতীয় শক্তি তাক্ওয়ার যখন সমন্বয় ঘটবে তখনই প্রতিটি কাজ ও পদক্ষেপ জাতির কাছে এবং আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। আর তার প্রতিদান হিসেবে আল্লাহ্পাক দেবেন রহমত এবং বরকত। মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ

যখন কোনো দেশের জনগণ ঈমান এবং তাক্ওয়ার ভিত্তিতে সমাজ পরিচালনা করে, তখন আল্লাহ্ পাক সেই সমাজের জন্য আসমান এবং যমীনের সমস্ত রহমতের দরজা খুলে দেন। (আ'রাফ-৯৬)

حَقَّ تُقٰتِهٖ তাক্ওয়ার হক আদায় করে ভয় করো।

তাক্ওয়ার হক কিঃ? তাক্ওয়ার হক এর ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ, রবী, কাতাদাহ ও হাসান বসরী (রাঃ) বলেন, তাছাড়া

রাসূল (সাঃ) নিজেও বলেছেনঃ তাক্ওয়ার হক হলো, প্রতিটি কাজে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করা, আনুগত্যের বিপরীত কোনো কাজ না করা, আল্লাহ্‌কে মনের মধ্যে সার্বক্ষণিক স্মরণ রাখা, কখনও ভুলে না যাওয়া এবং সবসময়ই তাঁর শোকরিয়া আদায় করা এবং অকৃতজ্ঞ না হওয়া। (বাহরে মুহীত)।

হকঃ অর্থ প্রাপ্য, পাওনা বা অধিকার। যেমন পিতার মৃত্যুর পর সন্তানেরা তার সম্পদের হকদার বা উত্তরাধিকারী হয়ে যায়। যা কেউ হস্তক্ষেপ করার অধিকার রাখে না। তেমনি ভাবে আল্লাহ্‌কে ভয় করার যে হক বা প্রাপ্য রয়েছে সেভাবে হক আদায় করে ভয় করতে হবে। তাই আল্লাহ্ তাআলা এখানে বলেছেনঃ **তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো যেভাবে ভয় করা উচিত।** সূরা হজ্বের শেষ আয়াতে আল্লাহ্‌পাক জিহাদের কথা বলতে গিয়ে বলেছেনঃ

وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ

তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য জিহাদ করো জিহাদের হক আদায় করে। সাধারণভাবে কোনো কাজ নিখুতভাবে করতে চাইলে আমরা বলে থাকি, **কাজের মতো কাজ করো। খেলার মতো খেলা করো, পড়ার মতো পড়ো, লেখার মতো লেখ** ইত্যাদি। অর্থাৎ যে কাজটি যেভাবে করা উচিত তা সেভাবে এবং নিখুত ও আন্তরিকতার সাথে করার তাগাদা দেবার জন্যই আমরা এভাবে বলে থাকি।

তাক্ওয়ার স্তরঃ তাক্ওয়ার কতকগুলো স্তর বা পর্যায় রয়েছে। তার মধ্যে

প্রথম স্তর বা সর্বনিম্ন স্তরঃ কুফর ও শিরক থেকে বেঁচে থাকা। এ অর্থে প্রত্যেক মুসলমানকেই মুত্তাকীন বলা যায়- যদিও সে গোনাহ্‌র মধ্যে জড়িত থাকে। এ অর্থে কুরআনের অনেক জায়গায় 'মুত্তাকীন' বা 'তাক্ওয়া' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

দ্বিতীয় স্তর বা পর্যায়ঃ যা আসলে কাম্য, তা হলো এমন সব বিষয় থেকে বেঁচে থাকা, যা আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রাসূলের পছন্দনীয় নয়। কুরআন ও হাদীসে তাক্ওয়ার যেসব ফজিলাত ও কল্যাণের কথা বলা হয়েছে, এ স্তরের তাক্ওয়ার উপর ভিত্তি করেই বলা হয়েছে।

তৃতীয় স্তর বা সর্বোচ্চ স্তরঃ নবী রাসূলগণ এবং যারা তার প্রকৃত অনুসারী তারাই এ স্তরের তাক্ওয়া অর্জন করে থাকেন। অর্থাৎ অন্তরকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যসব কিছু থেকে বাঁচিয়ে রাখা এবং আল্লাহ্র স্মরণ ও তাঁর সন্তুষ্টি হাসিলের মাধ্যমে অন্তরকে পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ রাখা। আলোচ্য আয়াতে حَقَّ تُقٰتِهٖ অর্থাৎ তাক্ওয়ার হক আদায় করে আল্লাহ্কে ভয় করা। এ স্তরটিই হলো প্রকৃত তাক্ওয়ার হক। এ স্তরে পৌঁছার জন্য প্রতিটি মুমিন নর-নারীর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা উচিত।

তাক্ওয়াবান ব্যক্তি প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহ্কে স্মরণ রেখে ভয় করে চলে। যার কারণে তার জিহ্বা কোনো খারাপ বা গোনাহ্র কথা উচ্চারণ করে না, চোখ খারাপ কিছু দেখে না, কান খারাপ কিছু শোনে না, মাপে কম দেয় না, হারাম ভক্ষণ করে না, হারামের পর্যায়ে পড়ে এমন কোনো কাজ বা ভূমিকা রাখে না, সদাসর্বদা হারাম থেকে বেঁচে হালাল তালাশে থাকে এবং তার জন্য আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করে। হারামের মধ্যে জড়িয়ে যাবার ভয়ে সন্দেহযুক্ত হালাল এমনকি অনেক সন্দেহমুক্ত হালাল জিনিসও পরিহার করে। এ সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) বলেনঃ

لَايَبْلُغُ الْعَبْدُ اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ حَتّٰى يَدَعَ مَالَا بَأْسَ بِهٖ حَذَرًا لِّمَا بِهٖ بَأْسٌ

বান্দাহ ততক্ষণ পর্যন্ত মুত্তাকীদের মধ্যে শামিল হতে পারে না, যতক্ষণ না সে গোনাহ্র কাজে জড়িয়ে পড়ার ভয়ে ঐসব কাজও পরিহার করে যে সব কাজে কোনো গোনাহ্ নেই। (তিরমিযী, রাবী আতিয়া আস-সাআদী রাঃ)। অন্য হাদীসে হযরত উমর (রাঃ) বলেছেনঃ **হারামে জড়িয়ে যাবার ভয়ে আমরা হালাল জিনিসের দশ ভাগের নয় ভাগই পরিত্যাগ করে থাকি।**

বাস্তব উদাহরণঃ একজন রাখালের জন্য গরু-ছাগল মাঠে ফসলের জমির সীমানা বা আইল পর্যন্ত চরানো বৈধ। কিন্তু পাশের জমির ফসলে হঠাৎ করে মুখ দিয়ে ক্ষতি করার ভয়ে সে তার গরু-ছাগল জমির ফসলের আইল থেকেও অনেক দূরে রাখে। এটাই হলো একজন মুত্তাকী ব্যক্তির

তাক্ওয়ার বাস্তব উদাহরণ। দুনিয়ার জীবনে পাপ থেকে বাঁচার উদাহরণ দিয়ে হযরত উমর (রাঃ) বলেনঃ "কন্টাকাকীর্ণ রাস্তায় চলাচলের সময় যেমন কাপড়-চোপড় গুটিয়ে আঁটো-সাঁটো হয়ে চলতে হয়। তেমনিভাবে দুনিয়ার জীবনে পাপ থেকে বাঁচার জন্য একজন মুত্তাকী ব্যক্তিকে সতর্কতার সাথে বেছে বেছে চলতে হয়।"

তাই শুধু–নামায, রোজা, হজ্ব পালন করেই ইসলামের সব কাজ করা হয়েছে মনে করে দুনিয়ার জীবনে গা ভাসিয়ে দিয়ে চললে হবে না। দুনিয়ার এই প্রতিকুল পরিবেশেই আল্লাহ্‌কে পাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। দুনিয়ার এই জীবনে প্রতিটি ধাপ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ফেলতে হবে। প্রতিটি কাজ আল্লাহ্‌কে ভয় করে তারই সন্তুষ্টির জন্য করতে হবে। প্রকৃত পক্ষে একজন মুত্তাকী ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য এটাই হওয়া উচিৎ। অতঃপর আল্লাহ্ পাক মুমিনদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ

وَلَاتَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ

আর তোমরা প্রকৃত মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। অর্থাৎ ইসলামের উপরই মৃত্যুবরণ করো। সারা জীবন ইসলামের উপর কায়েম থাকো, যাতে করে মৃত্যুও তার উপরেই হয়। ঈমান ও তাক্ওয়ার বহিঃপ্রকাশ হলো, ইসলামের যাবতীয় হুকুম আহকাম পালন করা। আর যারা ইসলামের যাবতীয় কাজ আঞ্জাম দিয়ে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে, তাদেরকেই মুসলমান বলা হয়। মৃত্যু এমন এক অদৃশ্য বস্তু, কখন যে মানুষকে পাকড়াও করবে তা সে মোটেই জানে না। সুতরাং যে ব্যক্তি মুসলমান না হয়ে মরতে রাজি নয়, তার কাজ হবে সব সময় এবং প্রতিটি মুহূর্ত একশভাগ মুসলমান হয়ে থাকার চেষ্টা করা। কেননা যার যে অবস্থার উপর মরণ হবে তার উপরই কিয়ামতের দিন তাকে উঠানো হবে। হযরত জাবের (রাঃ) বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর মৃত্যুর তিনদিন আগে তাঁর মুখে বলতে শুনেছিঃ "দেখ, তোমরা মৃত্যুর সময় আল্লাহ্‌র প্রতি ভালো ধারণা রাখবে।" (মুসলিম)। মুসনাদে বায্যারে রয়েছে, "রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এক আনসারী রুগীকে দেখতে গেলেন। সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, অবস্থা কিরূপ? তিনি প্রতিউত্তরে বললেনঃ

www.icsbook.info

আলহামদু লিল্লাহ্ ভালই আছি। আল্লাহ্র দয়ার আশা করছি এবং তাঁর শাস্তির ভয় করছি। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তখন বললেনঃ জেনে রেখো এরূপ অবস্থায় যার অন্তরে আশা ও ভয় দুটোই থাকে আল্লাহ্ তার আখাংকার জিনিস প্রদান করেন এবং ভয়ের জিনিস হতে রক্ষা করেন।"

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ইসলামের উপর টিকে থাকার জন্য প্রায় অধিকাংশ সময়ই আল্লাহ্র কাছে দোয়া করতেন ঃ

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبُ سَبِّتْ قُلُوْبَنَا عَلٰى دِيْنِكَ

হে আমাদের দেলকে পরিবর্তনকারী, আমাদের দেলসমূহকে তোমার দ্বীনের উপর রাখো।

يَامُصَرِّفَ الْقُلُوْبُ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلٰى طَاعَتِكَ

হে আমাদের দেলসমূহকে উলট-পালটকারী, আমাদের দেলসমূহকে তোমার আনুগত্যের দিকে ঘুরিয়ে দাও। (মুসলিম)। আয়াতে প্রকৃত মুসলমান বলতে পূর্ণভাবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে এবং অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকতে বলা হয়েছে। **হে পরওয়ার দেগার! আমাদেরকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ইসলামের উপর টিকে থাকার তাওফীক দাও এবং মৃত্যুর সময় কালেমার সাথে মৃত্যু দান করিও, আমিন।**

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا - وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاۤءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖۤ اِخْوَانًا - وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ -

আর তোমরা সকলে আল্লাহ্র রজ্জু (দ্বীন)কে ঐক্যবদ্ধভাবে শক্ত হাতে ধারণ করো; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যেও না। আর তোমরা আল্লাহ্র সেই অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো, যা তোমাদেরকে তিনি দান করেছেন। (এক সময়) তোমরা একে অপরের শত্রু ছিলে, অতঃপর

আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা পয়দা করে দিয়েছেন। ফলে এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহের কারণে একে অপরে ভাই ভাই হয়ে গেছো। (আসলে তো) তোমরা এক অগ্নিকুন্ডের পাড়ে অবস্থান করছিলে। অতঃপর তা থেকে তোমাদেরকে তিনি উদ্ধার করেছেন। এভাবেই আল্লাহ্ তাঁর নিজের নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা সুপথ পাও।

শানে নুযুলঃ আলোচ্য আয়াতটি অবতরণের কারণ সম্পর্কে ইবনে কাসীর তাঁর তাফসীরে তিনটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

প্রথম ঘটনাঃ মদীনায় আল্লাহ্র রাসূল আগমনের ফলে চির দুষমন 'আউস' ও 'খাযরাজ' গোত্র দুটি ইসলাম কবুল করে একে অপরে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায়। এটা তাদেরই পড়শী ইহুদীরা বরদাস্ত করতে পারছিলো না। তাই তারা তাদের পূর্ব শত্রুতার দিকে পুনরায় ফিরিয়ে নেবার জন্য সুযোগ খুজছিলো। এমনি ভাবে একটা মহা সুযোগ তারা পেয়ে যায়। একবার এক ইহুদী আউস ও খাযরাজদের সম্মিলিত স মাবেশের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। এসময় উক্ত গোত্র দু'টির পারস্পারিক মিল-মহব্বত ও একতার দৃশ্য দেখে তার গা জ্বালা হয়ে যায়। ফলে সে হিংসার বসবতী হয়ে শত্রুতার উদ্দেশ্যে চক্রান্তের জন্য তাদের সমাবেশে যোগদানের জন্য একজন লোক পাঠায়। লোকটি এসে তাদের কথাবার্তায় যোগ দেয় এবং সুযোগ বুঝে ঐ গোত্র দু'টির মধ্যে অতীতের শত্রুতা ও যুদ্ধ বিগ্রহের কথা বিশেষ করে 'বুআস' যুদ্ধের তিক্ত ইতিহাস তুলে ধরে এবং তাদের মধ্যে বিদ্বেষ ও বিভেদ ছড়ানোর ষড়যন্ত্র করে। অবশেষে তার এই হিংসাত্মক ষড়যন্ত্র সফল হয় এবং আউস ও খাযরাজ গোত্র দু'টির মধ্যে ভীষণ প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে ওঠে। ফলে নিভে যাওয়া তাদের আক্রোসের আগুন পুনরায় দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে এবং একে অপরের বিরুদ্ধে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। তারা ক্রোধের আগুনকে আরো বাড়িয়ে দেবার জন্য বিভিন্ন প্রকার উস্কানীমূলক শ্লোগান দেওয়া শুরু করে এবং হাতাহাতি ও অস্ত্র চালানোর পর্যায়ে চলে যায়। এমনকি 'হারারা' নামক ময়দানে একে অপরের সাথে মোকাবেলা করার জন্য ডাকাডাকি করতে থাকে। এ ঘটনাটি রাসূল (সাঃ) জানতে পেয়ে সাথে

www.icsbook.info

সাথে তাদের সভাস্থলে ছুটে আসেন এবং অবস্থা বেগতিক দেখে তিনি তাদেরকে শান্ত করতে গিয়ে বলেনঃ "কী আশ্চর্য ব্যাপার! আমি তোমাদের মাঝে উপস্থিত থাকার পরেও তোমরা যাহেলিয়াতের যুগের মতো একে অপরকে শক্তির বাহাদুরী পরীক্ষার জন্য ডাকাডাকি শুরু করে দিয়েছো?" অতঃপর তিনি তাদের সামনে অত্র আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। আল্লাহ্ পাকের মেহেরবাণীতে তাদের উপর কোরআনের এই আয়াতের প্রভাব পড়ে, ফলে তারা লজ্জিত হয়। তারা একে অপরের সাথে কোলাকুলি করে। এভাবে ইহুদীদের চক্রান্ত চরম ভাবে ব্যর্থ হয়ে যায়।

দ্বিতীয় ঘটনাঃ হুনায়েন যুদ্ধে বিজয় লাভ করার পর ধর্মীয় মঙ্গলের কথা চিন্তা করে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) গাণিমাতের মাল বন্টন করতে গিয়ে কোনো কোনো লোককে কিছু বেশী দেন। এতে কোনো একজন লোক রাসূলের এই কাজে কটুক্তি করে। ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আনসার দলকে একত্রিত করে একটি ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি এ কথাও বলেনঃ "হে আনসারের দল! তোমরা কি পথভ্রষ্ট ছিলে না, অতঃপর আমার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের সুপথ দান করেন ? তোমরা কি দলে দলে বিভক্ত ছিলে না, অতঃপর আল্লাহ্ আমারই কারণে তোমাদের অন্তরে ভালোবাসা সৃষ্টি করেন? তোমরা গরীব কি ছিলে না, অতঃপর আল্লাহ্ আমারই মাধ্যমে তোমাদেরকে ধনী করেন ? প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে এই পবিত্র দলটি আল্লাহ্র শপথ করে সবাই একই সুরে সুর মিলিয়ে বলে ওঠেনঃ আমাদের উপর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) এর অনুগ্রহ এর চেয়েও বেশী রয়েছে।

তৃতীয় ঘটনাঃ হযরত ইকরামা (রাঃ) বলেনঃ হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) কে যখন মুনাফিকরা মিথ্যা দোষারোপ করেছিলো এবং তাকে দোষ থেকে মুক্ত করে আল্লাহ্ তাআলা আয়াত নাযিল করেছিলেন, তখন মুসলমানেরা একে অপরের বিরুদ্ধে লেগে পড়েছিলো, সেই সময় এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিলো।"

মোট কথা মদীনার আউস ও খাযরাজ গোত্র রাসূল (সাঃ) এর আগমনে এবং ইসলাম কবুল করার কারণে তাদের মধ্যে জাহেলিয়াতের যুগের চির

www.icsbook.info

দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে যে মহব্বত পয়দা হয়ে ইস্পাত তৈরী প্রাচীরের ন্যায় ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলো। এটা তাদেরই পড়শী ইসলামের শত্রু বানু নাযীর ও বানু কাইনুকা গোত্রের ইহুদীদের চক্ষুশূল ও গা জ্বালার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। এজন্য তাদের উভয়ের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টির জন্য তারা সর্বদা চেষ্টায় নিয়োজিত ছিলো।

حَبْلِ اللّٰهِ অর্থ -আল্লাহ্‌র রজ্জু। রজ্জু বলতে কুরআন তথা দ্বীনকে বোঝানো হয়েছে। হযরত যায়েদ ইবনে আরকামের বর্ণনায় বলা হয়েছেঃ حَبْلُ اللّٰهِ هُوَ الْقُرْاٰنُ অর্থাৎ **আল্লাহ্‌র রজ্জু হচ্ছে কুরআন।** (ইবনে কাসীর)। কুরআন অথবা দ্বীনকে রজ্জুর সাথে তুলনা করার কারণ হলো, এটা এমন এক সম্পর্ক, যা একদিকে আল্লাহ্‌র সাথে ঈমানদারদের সম্পর্ক জুড়ে দেয়, অপরদিকে সমস্ত ঈমানদারদেরকে একে অপরের সাথে মিলিয়ে এক জামায়াতবদ্ধ করে দেয়।

جَمِيْعًا–অর্থ ঐক্যবদ্ধ, দলবদ্ধ বা জামায়াতবদ্ধ। এটা হলো মুসলমানদের জাতীয় শক্তির দ্বিতীয় ভিত্তি।

ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দুঃ যে কোনো ঐক্যের একটি বিশেষ কেন্দ্র থাকা উচিত। বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন মত রয়েছে। কোথাও বংশগত, কোথাও গোত্রগত, কোথাও ভাষাগত, আবার কোথাও বর্ণগত সম্পর্ককে ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছে। কিন্তু আল-কোরআন এই ঐক্যকে স্বীকার করে না। বরং এসব কিছুকে বাদ দিয়ে ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু "হাবলুল্লাহ" অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রজ্জু তথা দ্বীন ইসলামকে নির্ধারণ করেছে। আর ইসলাম এও বলে দিয়েছে যে, মুমিন মুসলমানেরা সবাই একই জাতি। চাই সে যে জাতি, বর্ণ, গোত্র বা রং এর হোক না কোনো।

মোট কথা আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদেরকে দুটো বিষয়ে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রথমতঃ তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র পাঠানো জীবন ব্যবস্থা আল-কুরআনের অনুসারী হয়ে যাও। দ্বিতীয়তঃ একে সবাই মিলে জামায়াতবদ্ধ ভাবে আকড়ে ধরো, যাতে করে মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। জামায়াতবদ্ধ জীবন যাপন করার নির্দেশ

www.icsbook.info

দেবার পরক্ষণেই আল্লাহ্‌পাক বলেনঃ

وَلَا تَفَرَّقُوْا **তোমরা দলাদলি করে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেও না**। আয়াতে আল্লাহ্‌পাক প্রথম দিকে ঐক্যের পজেটিভ দিক তুলে ধরার পর নেগেটিভ দিক। وَلَا تَفَرَّقُوْا **তোমরা পরস্পর বিভেদ সৃষ্টি করো না** বলে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছেন। আল-কুরআনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো মুসলমানদেরকে প্রায় জায়গায় নির্দেশ দিতে গিয়ে যেমন পজেটিভ কথা বলা হয়েছে। তেমনি সাথে সাথে সেখানে নেগেটিভ কথাও বলে দেয়া হয়েছে। অনুরূপ ভাবে এখানেও ঐক্যবদ্ধ বা জামায়াতবদ্ধ জীবনের বিপরীত পথে অগ্রসর হতে বারণ করে দেয়া হয়েছে।

সহীহ মুসলিম শরীফে উল্লেখ রয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ্ তাআলা তিনটি কাজে খুশী হন এবং তিনটি কাজে বেজার হন। যে তিনটি কাজে আল্লাহ্ খুশী হন তা হলোঃ (১) একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার ইবাদত করা এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক না করা। (২) ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহ্‌র দ্বীনকে ধারণ করা এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে না যাওয়া। আর (৩) মুসলমান শাসকদের সহযোগীতা করা। যে তিনটি কাজে আল্লাহ্ বেজার হন তা হলোঃ (১) বাজে ও অনর্থক কথা বলা। (২) বেশী বেশী প্রশ্ন করা এবং (৩) সম্পদ ধ্বংস করা। (ইবনে কসীর)।

মোট কথা মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্যের ফলই হলো তাদের পতন ও ধ্বংস। যুগেযুগে দেখা গেছে যখনই তাদের দ্বীনের ব্যাপারে অনৈক্য সৃষ্টি হয়েছে, তখনই তাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। বর্তমানকালে গোটা দুনিয়ার মুসলমানেরা দ্বীনের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ না হবার কারণেই নিজেদের মধ্যে কাদা ছোড়াছোড়ি করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। আর এই সুযোগে আল্লাহ্, আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) এবং মুসলমানদের চির শত্রু ইহুদী, খৃষ্টান এবং মুশরিকরা অন্যায় এবং যুলুম নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। আর ষড়যন্ত্র করে মুসলমানদেরকে উসকিয়ে দিয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহে জড়িয়ে দিচ্ছে।

মুসলমানদেরকে জামায়াতবদ্ধ জীবন যাপন এবং পরস্পর হানাহানি থেকে

www.icsbook.info

বিরত থাকার নির্দেশ দেবার পর আয়াতের পরবর্তী অংশে তাঁর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন ঃ

اُذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ اِخْوَانًا

"তোমরা স্মরণ করো আল্লাহ্‌র সেই অনুগ্রহের কথা যখন তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু। অতঃপর তিনিই তোমাদের অন্তরগুলো ভালোবাসায় জুড়ে দিয়েছেন। ফলে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ ও মেহেরবানীতে ভাই ভাই হয়ে গেলে।"

অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা মুমিনদেরকে দু'টো অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

প্রথম অনুগ্রহঃ আয়াতে মুমিনদের জন্য প্রথম অনুগ্রহ হলো ভ্রাতৃত্ব। যা ইসলামী জীবনের দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় চরিত্র। জাহেলিয়াতের যুগে মদিনার আউস এবং খাযরাজ গোত্র দু'টির মধ্যে কেন্দ্রীয় কোনো রাষ্ট্র ব্যবস্থা না থাকার কারণে তাদের নিজেদের মধ্যে মারামারি, কাটাকাটি, ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকতো। তারা একে অপারের চরম দুষমন ছিলো। কেউ কাউকে বরদাস্ত করতে পারতো না। তাদের এই শত্রুতা দীর্ঘদিন থেকে চলতে ছিলো। এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌পাক মেহেরবাণী করে তাঁর পিয়ারা হাবীবকে দ্বীন ইসলাম সহ হিজ্‌রাতের মাধ্যমে মদীনায় আগামন ঘটিয়ে তাদের মধ্যে দীর্ঘদিনের লালিত শত্রুতা দূর করলেন। তাদের অন্তরে দ্বীনের কারণে মহব্বত ও ভালবাসা পয়দা করে দিলেন। ফলে তারা একে অপরের বন্ধুতে পরিণত হয়ে গেলো। তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে পূর্বের সব কিছু ভুলে গিয়ে এক হয়ে গেলো। হিংসা-বিদ্বেষ বিদায় নিলো। তারা পরস্পর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ভাই ভাই হয়ে গেলো। তারা নেকীর কাজে একে অপরের সাহায্যকারী এবং আল্লাহ্‌র দ্বীনের খাদেম বনে গেলো। আল্লাহ্‌র রাসূলের পাশে এসে দাঁড়ালো। এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌পাক অন্য আয়াতে বলেনঃ

هُوَ الَّذِيْٓ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ- وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ

www.icsbook.info

তিনিই সেই আল্লাহ্ যিনি নিজ মদদ দিয়ে এবং মুমিনদের সাহায্য দ্বারা তোমাকে শক্তিশালী করেছেন এবং তাদের অন্তরে প্রেম-প্রীতি পয়দা করে দিয়েছেন। (সূরা আনফাল-৬১-৬২)

এখানে একটি বিশেষ তাত্ত্বিক দিক হলো এই যে, আল্লাহ্পাক আয়াতে فَأَلَّفَ بَيْنَكُمْ- **তোমাদের পরস্পরকে জুড়ে দিলেন** না বলে বলেছেনঃ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ **তোমাদের পরস্পরের অন্তরগুলোকে জুড়ে দিলেন।** তাত্ত্বিক দিক হলো, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে একে অপরের মধ্যে জুড়ে দিলে সেটা স্থায়ী হয় না। সেই মিল হয় ঠুনকো মিল যা সামান্যতেই ভেঙ্গে যায়। কিন্তু অন্তর বা মনের দিক থেকে যদি কারো মিল মহব্বত হয়ে যায়, তখন সেটাই হয় স্থায়ী এবং শক্তিশালী। আর মনের মিলের জন্যই তো মুমিনেরা একে অপরের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়।

মুসলমানদের মিল-মিশ বা ঐক্য আল্লাহ্র আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল। তাদের অন্তরের এই মিল-মহব্বত আল্লাহ্র আনুগত্য এবং দ্বীনের কারণে। এটা দুনিয়ার কোনো স্বার্থের কারণে নয়। আউস এবং খাযরাজ গোত্রের মধ্যে চিরদিনের দুষমনির অবসান ঘটিয়ে অন্তরের যে মিল-মহব্বত সৃষ্টি হয়েছিলো, তা একমাত্র আল্লাহ্র দ্বীনের কারণেই হয়েছিলো। তারা আল্লাহ্র আনুগত্য এবং রাসূলকে সাহায্য করার জন্য একমত হয়েছিলো। তাই এটা ছিলো আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে তাদের প্রতি, শুধু তাদের প্রতিই নয়, দুনিয়ার সকল মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ্র বিশেষ দয়া বা অনুগ্রহ।

দ্বিতীয় অনুগ্রহঃ

وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا

হে মুমিনগণ! তোমরা একেবারে অগ্নিকুন্ডের পাড়ে অবস্থান করেছিলে। সেখান থেকে আল্লাহ্ তোমাদেরকে উদ্ধার করেছেন। এই আয়াতাংশের অর্থ মুফাস্সীরগণ দু'ভাবে করেছেন। একজন মুফাচ্ছির এভাবে অর্থ করেছেন "হে মুমিনগণ! মূলতঃ তোমরা ছিলে শত্রুতা ও

হানাহানির আগুনে ভরা গভীর খাদের কিনারায় দাঁড়ানো। যে কোনো সময় সেখানে নিমজ্জিত হয়ে নিশ্চিত ধ্বংস হয়ে যেতে। সেই নিশ্চিত ধ্বংসের কবল থেকে আল্লাহ্ তাঁর দ্বীনের রহমত দিয়ে তোমাদেরকে সেখান থেকে উদ্ধার করলেন। "আউস ও খাযরাজ গোত্রের দীর্ঘদিনের হানাহানির কারণে যে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিলো এখানে তাকে অগ্নিকুন্ডের সাথে তুলনা করা হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহে রাসূলের আগমন ঘটিয়ে দ্বীন ইসলামের বন্ধন দিয়ে তোমাদেরকে সেই অশান্তির আগুনের ধ্বংসকূপ থেকে উদ্ধার করেছেন।" (সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ)।

অপর মুফাস্সির এভাবে অর্থ করেছেন- "হে মুমিনগণ! তোমরা একেবারে দোযখের আগুনের ধারে পৌঁছে গিয়েছিলে এবং তোমাদের কুফরী তোমাদেরকে তার ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দিতো। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের ইসলাম গ্রহণের তাওফীক প্রদান করে তোমাদেরকে সেই আগুন থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছেন।" (ইবনে কাসীর)। এখানে আউস ও খাযরাজ গোত্র জাহেলিয়াতের কারণে হানাহানির মাধ্যমে যে চরম গোনাহর মধ্যে লিপ্ত ছিলো। যার পরিণতি ছিলো নিশ্চিত জাহান্নাম। পরবর্তীতে আল্লাহ্পাক মেহেরবাণী করে রাসূল (সাঃ)কে পাঠিয়ে ইসলাম কবুল করার সুযোগ করে দিয়ে তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচিয়ে নিলেন।

আমার ব্যক্তিগত মতে উভয় অর্থই সঠিক। কেননা জাহেলিয়াতের কারণে হানাহানিতে লিপ্ত থেকে তারা দুনিয়ার জীবনকে অশান্তির অগ্নিকুন্ড বানিয়ে নিয়েছিলো। অপরদিকে তাদের জাহেলিয়াতের এই পাপের কারণে আখেরাতেও জাহান্নামে যাবার ব্যবস্থা করে নিয়েছিলো। অর্থাৎ উভয় জগতে তারা নিজেদেরকে নিজেরাই ধ্বংস করতে বসেছিলো। আল্লাহ্ মেহেরবাণী করে ইসলাম কবুল করার সুযোগ করে দিয়ে তাদেরকে উভয় জগতের ক্ষতি থেকে মুক্তি দান করেন। এটা হলো আল্লাহ্র অনুগ্রহের মধ্যে দ্বিতীয় অনুগ্রহ।

প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! ইহুদীরা যেমন মদীনার মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির মাধ্যমে ঐক্য বিনষ্ট করতে সদা তৎপর ছিলো, অনুরূপ ভাবে

www.icsbook.info

আজও সেই ইহুদী, খৃষ্টান এবং তার দোষরেরা একই চক্রান্ত অব্যাহত রেখেছে। শুধু এখন কেন, আগামীতেও তাদের তৎপরতা অব্যাহত রাখবে। তাই আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানদেরকে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে বলেনঃ তাদের অনুসরণ করো না, তাদের কথায় কান দিও না এবং তাদের ষড়যন্ত্রের জালে পা ফেলিও না।

সুতরাং মুসলমানদের এখন কর্তব্য হবে-ইহুদী, খৃষ্টান ও তাদের দোষরদের ষড়যন্ত্র ও আক্রমণের মুখেও নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য সতর্ক থাকা এবং সংগ্রাম আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া। আল্লাহ্র যমীনে আল্লাহ্র দ্বীনকে পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা এবং মিথ্যার উপর সত্যকে বিজয়ী করার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে আমরণ সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। অতঃপর আল্লাহ্পাক বলেনঃ

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ

এমনি ভাবে আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শন সমূহ বর্ণনা করেন।

মোট কথা মুসলমানেরা যদি শক্তিশালী সংগঠন ও ঐক্য কামনা করে, তবে এর একমাত্র উপায় হলো আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্যকে সব সময়ের জন্য মনে প্রাণে মেনে নেয়া। যারা সত্যিকার অর্থে সচেতন, তারা উপরে বর্ণিত আলামতগুলো দেখে নিজেরাই আন্দাজ করতে পারেন। মুসলমানদের জন্য কল্যাণ রয়েছে দ্বীনকে মজবুত ভাবে আকড়ে ধরে আল্লাহ্র আনুগত্যের মধ্যে। তাদের প্রকৃত হিতাকাংখী ও কল্যাণকামী হলেন স্বয়ং আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ)। ইহুদী, খৃষ্টান মুশরিক, মুনাফিক এবং তার দোষরেরা কোনো দিনই এবং কোনো সময়ের জন্যই মুসলমানদের হিতাকাংখী ও কল্যাণকামী হতে পারে না। এজন্য তাদেরকে সবসময় দুষমন মনে করে সতর্কতার সাথে চলতে এই আয়াতের শেষাংশে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ্পাক মুসলম-ানদের করণীয় সম্পর্কে বলেনঃ

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা সৎ কাজের দিকে ডাকবে, ভাল কাজের নির্দেশ দিবে এবং অন্যায় ও খারাপ কাজ থেকে বারণ করবে। আর তারাই হলো সফলকাম।

মুসলমানদের জাতীয় ও সমষ্টিগত কল্যাণঃ এই আয়াতে আল্লাহ্পাক মুসলমানদের সামগ্রিক কল্যাণ কিসে নিহিত আছে তা উল্লেখ করেছেন। আগের আয়াতে মুসলমানদের সামগ্রিক কল্যাণের প্রথম নির্দেশটি বর্ণনা করেছেন। তা হলো খোদাভীতি ও আল্লাহ্র দ্বীনকে জামায়াতবদ্ধ হয়ে শক্ত ভাবে ধারণ করে আত্মসংশোধন করা। আর অত্র আয়াতে দ্বিতীয় নির্দেশটি উল্লেখ করে বলা হয়েছে, প্রচার বা তাবলীগের মাধ্যমে অপরের সংশোধন করা।

أمة-(উম্মাহ্) শব্দের অর্থ জাতি, দল, গোষ্ঠি বা সম্প্রদায়। হযরত যাহ্হাক (রাঃ) বলেনঃ এই দল হতে ভাবার্থ হচ্ছে-বিশিষ্ট সাহাবা (রাঃ) ও বিশিষ্ট হাদীসের বর্ণনাকারীগরণ। অর্থাৎ মুজাহিদ ও আলেমগণ। (ইবনে কাসীর)।

হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ-আয়াত তেলাওয়াত করে বলেছিলেনঃ এ সম্প্রদায়টি হচ্ছে বিশেষ ভাবে সাহাবায়ে কেরামের দল। (ইবনে জরীর)। কেননা, তাঁদের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেকে এ কাজের জন্য দায়ী মনে করতেন।

এখন সাহাবায়ে কেরাম উপস্থিত নেই। কিন্তু যারা তাঁদের অনুসারী তারাই হচ্ছে সত্যনিষ্ঠ দল। কেননা, কোরআনের কোনো আয়াত সাময়িক কোনো নির্দেশ বা উপদেশ নিয়ে অবতীর্ণ হয়নি। এর কার্যকারিতা কেয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত বলবত থাকবে।তাই وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أمة বলতে সদাসর্বদা সত্যনিষ্ঠ একদল লোক থাকবে, যারা নিজেদের

আমল-আখলাককে আল্লাহ্‌র দেয়া আইন দ্বারা সংশোধন করবে এবং অপর ভাইদেরও আমল-আখলাককে সংশোধন করার জন্য চেষ্টা চালাবে। এ ব্যাপারে সূরা আসরে আল্লাহ্‌পাক বলেনঃ

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ-

(পরকালের ক্ষতি থেকে কেবলমাত্র তারাই রক্ষা পাবে) যারা ঈমান আনবে, সৎকাজ করবে, পরস্পরকে ভালো ও কল্যাণকর কাজের জন্য নির্দেশ দেবে এবং পরস্পরকে ধৈর্য্য ধরার জন্য পরামর্শ দেবে।

সত্যনিষ্ঠ দলের কাজঃ

প্রথম কাজঃ يَدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ -এই সত্যনিষ্ঠ দলের প্রথম কাজ হবে তারা মানুষকে খায়ের বা কল্যাণের দিকে ডাকবে। এ কল্যাণ বলতে এমন কল্যাণ যা দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় জগতের জন্য উপকারী বা কল্যাণকর হবে।

দাওয়াতের পর্যায়ঃ কল্যাণের দিকে ডাকার দু'টি পর্যায় রয়েছে।

প্রথম পর্যায়ঃ কল্যাণের দিকে ডাকার প্রথম পর্যায় হলো অমুসলিমদেরকে খায়র তথা ইসলামের দিকে আহবান জানানো। এ কাজটি প্রতিটি মুসলমান সাধারণভাবে এবং উল্লেখিত বিশেষ (সত্য নিষ্ঠ) দলটি বিশেষভাবে দুনিয়ার সব জাতির লোকদেরকে ইসলামের দিকে ডাকবে-মুখের দ্বারা এবং বাস্তব চরিত্র ও কর্মের মাধ্যমে। তার কারণ হলো **দায়ী ইলাল্লাহ্‌র 'দায়ী'** বা আহবানকারীদের কথায় ও কাজের মিল থাকতে হবে। তাদেরকে আর সব জাতির লোকদের থেকে জ্ঞান গরিমা, শিক্ষা-দীক্ষা, কর্ম ও চরিত্রের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে প্রাধান্য অর্জন করতে হবে। যেভাবে রাসূল (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীরা অর্জন করেছিলেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ঃ 'খায়র' বা কল্যাণের প্রতি স্বয়ং মুসলমানদের আহবান করা। অর্থাৎ সকল মুসলমান সাধারণ ভাবে এবং উল্লেখিত (সত্য নিষ্ঠ) দলটি বিশেষ ভাবে মুসলমানদের মধ্যে তাবলীগ বা প্রচারের কাজ চালাবে

www.icsbook.info

দাওয়াত দু'ভাবে হবেঃ প্রথমটি হলো ব্যাপক দাওয়াত অর্থাৎ সকল মুসলমানদেরকে শরীয়তের প্রয়োজনীয় বিধিবিধান ও ইসলামী চরিত্র সম্পর্কে অবহিত করবে। আর দ্বিতীয়টি হলো বিশেষ দাওয়াত অর্থাৎ মুসলমানদেরকে কুরআন ও সুন্নাহ্র বিশেষ শিক্ষায় বিশেষজ্ঞ তৈরী করতে হবে।

সর্বউত্তম কথাঃ যারা 'দায়ী' বা দাওয়াতী কাজ করে তাদের কথার মর্যাদা সম্পর্কে বলতে গিয়ে আল্লাহ্পাক বলেনঃ

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ–

তার কথার চেয়ে কার কথা সবচেয়ে বেশী উত্তম, যে আল্লাহ্র দিকে মানুষকে ডাকে এবং নিজে ভালো কাজ করে, আর দাবী করে নিশ্চয়ই আমি মুসলমান। (হা-মীম-সিজদা-৩৩)

সত্যনিষ্ঠ দলের দ্বিতীয় কাজঃ অতঃপর পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্পাক এই সত্যনিষ্ঠ দলের বিশেষ কাজ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেনঃ

وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِط وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ–

তারা সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ ও অন্যায় কাজে বাধা সৃষ্টি করে।

مَعْرُوْفِ ("মায়ারূফ) শব্দের অর্থ- **পরিচিতি।** ইসলাম যেসব সৎ ও নেক কাজের নির্দেশ দিয়েছে এবং প্রত্যেক নবী আপন আপন যুগে যেসব সৎ কাজের প্রচলন করেছেন, তা সবই আয়াতে উল্লেখিত 'মারূফ' তথা সৎ কাজের অন্তর্ভূক্ত। যেহেতু এসব সৎকাজ সাধারণ ভাবে সবার কাছে পরিচিত। তাই এগুলোকে 'মারূফ' বলা হয়েছে।

مُنْكَرْ–(মুন্‌কার) শব্দের **অর্থ অপছন্দ।** অর্থাৎ আল্লাহ্পাক যেসব কাজ অপছন্দ করেন বা নিষেধ করেছেন, যেসব কাজে গোনাহ রয়েছে, সেসব

www.icsbook.info

কাজই 'মুন্‌কার' এর পর্যায়ভুক্ত। আয়াতে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, পূর্বের বাক্যে يَدْعُوْنَ -বা আহবানের কথা বলা হয়েছে। আর এই বাক্যে يَأْمُرُوْنَ-বা আমর বা নির্দেশের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলার দু'টি নির্দেশের মধ্যে প্রথম নির্দেশটি দাওয়াত বা আহবানের জন্য ক্ষমতার প্রয়োজন হয় না। এখানে শুধু তাবলীগ বা প্রচারের মাধ্যমে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু পরবর্তী নির্দেশে امر বা আদেশ দিতে বলা হয়েছে। যেখানে ক্ষমতা না থাকলে এই কাজটি করা যায় না। সুতরাং বিশেষ দলের দ্বিতীয় কাজটি আঞ্জাম দেবার জন্য ক্ষমতার প্রয়োজন। কেননা নির্দেশ সেই দিতে পারে যার হাতে নির্দেশ দেবার মতো পাওয়ার বা ক্ষমতা থাকে। সুতরাং এই দলটিকে আল্লাহ্‌র নির্দেশ কার্যকরী করার জন্য ক্ষমতার অধিকারী হতে হবে। আর এই জন্য আন্দোলন সংগ্রাম করতে হবে। অসৎ নেতৃত্ব ও খোদাদ্রোহী শক্তিকে উৎখাত করে সৎ খোদাভীরু নেতৃত্ব কায়েমের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র বিধান চালু করতে হবে। আর ক্ষমতা পেলে তখনই ভালো কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজে নিষেধ করা যাবে। ভালো কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজে নিষেধের ক্ষেত্রে ক্ষমতার প্রয়োজন যে অবশম্ভাবী সে ব্যাপারে আল্লাহ্‌পাক বলেনঃ

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ-

তারাই খাঁটি ঈমানদার, যাদেরকে আমি পৃথিবীতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করলে তারা প্রথমেই নামায প্রতিষ্ঠা করে (জনগণের চরিত্র সংশোধন করে)। যাকাত ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে (অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করে) এবং (ভালো কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করে) সৎ কাজের নির্দেশ দেয় এবং (খারাপ কাজের পথ বন্ধ করে দিয়ে) অসৎ কাজে বাধা সৃষ্টি করে। (সূরা হজ্জ-৪১)

এখানে এই আয়াতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রধানের মৌলিক চারটি কাজের মধ্যে দু'টি কাজ সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ। সুতরাং এ কাজ

দু'টি করার জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রয়োজন। মন্দ কাজে বাধা দানের ক্ষেত্রে হাদীসে ঈমানদারদের তিনটি পর্যায় উল্লেখ করা হয়েছে-

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ (হে ঈমানদারগণ,) তোমাদের কেউ যখন কোনো অন্যায় ও অপরাধ হতে দেখবে, তখন যেনো সে হাত (ক্ষমতা) দ্বারা তা প্রতিহত করে। যদি এ কাজ করার পরিবেশ না পায়, তবে সে যেনো যবান (বক্তৃতা, বিবৃতি, আলাপ-আলোচনার) দ্বারা তা বন্ধ করে। এতেও যদি সে সক্ষম না হয়, তবে সে যেনো তার অন্তর দ্বারা ঘৃণা করে (এবং তা বন্ধ করার জন্য পরিকল্পনা করতে থাকে)। আর এটা (অন্তর দ্বারা ঘৃণা) হচ্ছে ঈমানের দুর্বলতম পর্যায়। (মুসলিম, মিশকাত)।

সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ না করার পরিনামঃ কোনো মুমিন মুসলমান যদি সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে বাধা সৃষ্টি না করে তবে তাদের পরিনাম সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) বলেনঃ

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللّٰهُ اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِنْدِهٖ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ

যে সত্তার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ, তোমরা সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে বারণ করতে থাকো। নতুবা আল্লাহ্ তাআলা অতিসত্ত্বরই তোমাদের উপর তাঁর শাস্তি অবতীর্ণ করবেন। অতঃপর তোমরা (তা থেকে বাঁচার জন্য) দোআ করবে কিন্তু তা কবুল করা হবে না। (আবু দাউদ)

দারসের আয়াতের সর্বশেষ অংশে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ-

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ **(যারা একাজ করে) তারাই হবে সফলকাম।**

অত্র আয়াতের শেষে আল্লাহ্পাক দাওয়াত দানকারী দলের প্রশংসা করে তাদের দুনিয়া এবং আখেরাতে সফলতার কথা ঘোষণা করেছেন। অর্থাৎ যারা **দায়ী ইলাল্লাহ্র** কাজ করে দুনিয়ার ক্ষমতা অর্জন করে। অতঃপর আল্লাহ্র বিধান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধের ভূমিকা পালন করে, তারা দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় জগতে সফলকাম হবে।

শিক্ষাঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! সূরা আলে ঈমরানের ১০২-১০৪ নম্বর আয়াত পর্যন্ত বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমাদের জন্য যেসব **শিক্ষনীয় রয়েছে তা হলোঃ**

❒ আমাদেরকে খাঁটি এবং নিষ্ঠাবান ঈমানদার হতে হবে। ঈমানের ক্ষেত্রে কোথাও কোনো দূর্বলতা ও সংশয় রাখা যাবে না।

❒ খোদাভীতি এমনভাবে অর্জন করতে হবে, যাতে শয়নে-বসনে, চলনে-বলনে, প্রতিটি অবস্থায় এবং প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহ্র ভয় মনের মধ্যে জাগরুক থাকে। দেহের প্রতিটি অংগে খোদাভীতি ফুটে উঠে।

❒ সদাসর্বদা ইসলামের উপর কায়েম থাকতে হবে। ইসলামের প্রতিটি আহকাম মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত পালন করে যেতে হবে। কুফরী বা গোনাহ্র কাজে জড়িত হবার সাথে সাথে আল্লাহ্র ভয় এবং মরণের কথা স্মরণ করে সে সব কাজ থেকে দূরে সরে যেতে হবে। আর আল্লাহ্র কাছে সদাসর্বদা এই বলে দোয়া করতে হবে "হে আল্লাহ্ আমাকে জীবিত রাখো দ্বীন ইসলামের উপরে এবং মৃত্যু দান করিও ঈমানের হালাতে।"

❒ আল্লাহ্র দ্বীনের উপর টিকে থাকার জন্য সদাসর্বদা জামায়াতবদ্ধ বা সংগঠনভূক্ত থাকতে হবে এবং সংগঠনের ভেতরে ও বাইরে সংকট সৃষ্টি করে পৃথক হয়ে যাওয়া যাবে না। বরং সংগঠনের ভেতরে ও বাইরে

www.icsbook.info

ঐক্যকে টিকে রাখার জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

❒ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য সংগঠনের কর্মীদের মধ্যে দ্বিনী সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। আঞ্চলিকতা ও ইজম সৃষ্টি করা যাবে না। কেননা এটা জাহেলিয়াতের নিদর্শন।

❒ ইসলামী আন্দোলনের সকল জনশক্তির মাঝে ইস্পাত প্রাচীর ভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলতে হবে। যাতে শয়তানি শক্তি বিলীন হয়ে যায়।

❒ সাহাবীদের অনুকরণীয় একটি সত্যনিষ্ঠ দলের সাথে জড়িত থেকে নিজেকে সংশোধন করতে হবে এবং অপরকে সংশোধনের জন্য দায়ী' ইলাল্লাহ্র কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

❒ একজন মমিন হিসেবে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ করার কাজ অব্যাহত রাখতে হবে এবং নির্দেশ দেবার অধিকারী হবার জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জনের জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে।

❒ দুনিয়া এবং আখেরাতের সফলতা অর্জনের জন্য দায়ী' ইলাল্লাহ্র ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। কেননা আল্লাহ্ তাদেরকেই প্রকৃত সফলকামী বলে সার্টিফিকেট দিয়েছেন।

আহবানঃ প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আমি দীর্ঘ সময় ধরে আপনাদের সামনে সূরা আলে ঈমরানের ১০২-১০৪ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও শিক্ষনীয় বিষয় তুলে ধরেছি। এতে যদি আমার অজান্তে কোনো ত্রুটি হয়ে যায়, তার জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। আর এসব আয়াতে যেসব শিক্ষনীয় বিষয় আমরা জানতে পারলাম, তা যেনো বাস্তব জীবনে প্রতিফলন ঘটিয়ে ইহকাল ও পরকালে সফলতা অর্জন করতে পারি সেই তৌফিক কামনা করে দারস শেষ করছি।

www.icsbook.info

তিন

মুমিন জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও তাদের বৈশিষ্ট্য

সূরা তাওবাহ্-১১১-১১২

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ
بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ
وَيُقْتَلُوْنَ- وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ
وَالْقُرْاٰنِ ط وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا
بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ط وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ-
اَلتَّائِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّائِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ
السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ ط وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ-

সরল অনুবাদঃ ইরশাদ হচ্ছে, (১১১) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদের জান-মাল জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন। তারা লড়াই করে আল্লাহ্‌র পথে, অতঃপর তারা (কাফেরদের) মারে এবং (নিজেরাও) মরে। (জান্নাত দানের) এই খাঁটি ওয়াদা এর আগে তাওরাত ও ইঞ্জিলে করা হয়েছিলো, আর (এখন) কুরআনেও করা হচ্ছে। আর আল্লাহ্‌র চেয়ে কে বেশী ওয়াদা পূরণ করতে পারে? অতএব (হে মুমিনেরা), তোমরা খুশী হয়ে যাও সেই কেনা-বেচার জন্য যা তোমরা তাঁর সাথে করেছো। আর এটাই তো হলো বড় সাফল্য। (১১২) তারা (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দ্বীনের মুজাহীদরা) হয়

www.icsbook.info

তওবাকারী, (নিষ্ঠার সাথে) এবাদতকারী, প্রশংসাকারী, (আল্লাহ্র পথে) ভ্রমণকারী, রুকু ও সিজদাহ্ আদায়কারী, সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দানকারী এবং আল্লাহ্র নির্ধারিত (হালাল-হারামের) সীমা রক্ষাকারী। অতএব হে নবী! (এসব গুনের অধিকারী) মুমিন মুজাহীদদেরকে (জান্নাতের) সুসংবাদ দান করুন।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ اِنَّ-নিশ্চয়। اِشْتَرٰى-খরিদ বা ক্রয় করা। -مِنْ-থেকে বা হতে। اَلْمُؤْمِنِيْنَ-মুমিনদের। اَنْفُسَهُمْ-তাদের জান বা জীবন। وَ-এবং। اَمْوَالَهُمْ-তাদের মাল বা ধন-সম্পদ। بِاَنَّ-বিনিময়ে। لَهُمْ- তাদের থেকে। يُقَاتِلُوْنَ- তারা লড়াই বা যুদ্ধ করে। فِىْ-মধ্যে। سَبِيْلِ اللّٰهِ-আল্লাহ্র পথে। فَيَقْتُلُوْنَ-অতঃপর তারা মারে বা হত্যা করে। يُقْتَلُوْنَ- তারা মরে বা নিহত হয়। وَعْدًا- প্রতিশ্রুতি বা ওয়াদা। عَلَيْهِ-উহার উপর। حَقًّا-সত্য বা খাঁটি। مَنْ-কে। اَوْفٰى-পূরণ বা রক্ষা। بِعَهْدِهٖ- তাঁর প্রতিশ্রুতি। مِنَ اللّٰهِ-আল্লাহ্র চেয়ে। فَاسْتَبْشِرُوْا- অতএব তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো বা খুশি হও। بِبَيْعِكُمْ-তোমাদের বেচা-কেনা বা ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য। اَلَّذِىْ- যারা। بَايَعْتُمْ بِهٖ- তোমরা তাঁর সাথে যা বেচা-কেনা বা চুক্তি করেছো। ذَالِكَ-এটা বা ঐটা। هُوَ-উহা বা তা। اَلْفَوْزُ-সাফল্য। اَلْعَظِيْمُ-উত্তম। اَلتَّائِبُوْنَ-তাওবাকারী। اَلْعٰبِدُوْنَ-(নিষ্ঠার সাথে) এবাদতকারী। اَلْحٰمِدُوْنَ-প্রশংসাকারী। اَلسَّائِحُوْنَ- ভ্রমণকারী অন্য অর্থে রোযা পালনকারী। اَلرّٰكِعُوْنَ-রুকুকারী। اَلسّٰجِدُوْنَ-সিজদাহ্ আদায়কারী। اَلْاٰمِرُوْنَ-নির্দেশ

দানকারী। اَلْمَعْرُوْفِ–উত্তম বা নেক। اَلنَّاهُوْنَ–নিশেধকারী বা বাধাদানকারী। عَنْ-থেকে। اَلْمُنْكَرِ-অপছন্দনীয় বা খারাপ। اَلْحٰفِظُوْنَ– সংরক্ষণকারী বা হেফাজতকারী।لِ–জন্য। - لِحُدُوْدِاللّٰهِ-আল্লাহ্‌র (নির্ধারিত) সীমা বা শরীয়াত।بَشِّرْ-সুসংবাদ দাও। اَلْمُؤْمِنِيْنَ–মুমিনদের।

সম্বোধনঃ দারসে কুরআন মাহফিলে/প্রোগ্রামে উপস্থিত ইসলাম প্রিয় দ্বীনদার/ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ভায়েরা/বোনেরা! আস্‌সালামু আলাইকুম অয়া রাহমাতুল্লাহি অয়াবারাকাতুহ্‌। আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কালামে হাকীম আল কুরআনের সূরা তাওবার ১১১ ও ১১২ দু'টি আয়াত তিলাওয়াত ও সরল অনুবাদ পেশ করেছি। আল্লাহ্‌পাক যেন আ-. মাকে আপনাদের সামনে সঠিক ভাবে দারস পেশ করার তাওফীক দান করেন। "অমা তাওফীকি ইল্লাহ্‌ বিল্লাহ্‌"।

সূরার নামকরণঃ এই সূরাটি দু'টি নামে পরিচিত। একটি "তাওবাহ্‌' আর অপরটি "বারাআত"।

তাওবাহ্‌ নামকরণঃ এই সূরাটির 'তাওবাহ্‌' নামকরণের কারণ এই যে, এই সূরার একস্থানে কোনো কোনো ঈমনাদার লোকদের তওবা কবুল করে গোনাহ্‌-খাতা মাফ করে দেবার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

বারাআত নামকরণঃ 'বারাআত' নামকরণের কারণ হলো সূরার শুরুতে মুমিনদেরকে মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। 'বারাআত' অর্থ সম্পর্ক ছেদ। তবে যে নামই হোক না কেনো তা প্রতিকী বা চিহ্ন হিসেবেই করা হয়েছে। শিরোনাম হিসেবে নামকরণ করা হয়নি।

সূরার শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ না লেখার কারণঃ সূরাটির শুরুতে 'বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রাহীম' লিখা হয়নি। এর কারণ হিসেবে তাফসীরকারকগণ বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করেছেন। কেউ বলেছেন, আল্লাহ্‌পাক মুশরিকদের আচরণে রাগান্বিত হয়ে সূরাটি নাযিল করেন, তার জন্য তিনি বিস্‌মিল্লাহ

www.icsbook.info

বলেননি। আবার কেউ বলেন যে, পূর্ব সূরা (আনফালের) জের। তাই আর বিস্‌মিল্লাহ্‌র প্রয়োজন হয়না। ইমাম রাযী (রঃ) যে কারণটি উল্লেখ করেছেন সেটিই হলো সবচেয়ে বেশী সঠিক এবং গ্রহণযোগ্য। আর তা হলো, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজেই এই সুরার শুরুতে **বিস্‌মিল্লাহ্** লিখেননি। বিধায় পরবর্তীতে সকলেই তাঁর অনুকরণ করেছেন।

জানার বিষয়ঃ তেলাওয়াতের সময় সূরার শুরু থেকে আরম্ভ করলে বিস্‌মিল্লাহ্ পড়া যাবে না। তবে যদি সূরার মাঝপথ হতে তেলাওয়াত করা হয় তবে 'বিসমিল্লাহ্' দিয়েই শুরু করতে হবে।

সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময়কালঃ সূরা তাওবাহ একই ভাষণে একই সময় অবতীর্ণ হয়নি। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। সূরাটি তিনটি ভাষণে সমাপ্ত হয়েছে।

প্রথম ভাষণঃ সূরার শুরু থেকে ৫ম রুকু পর্যন্ত চলেছে। ইহা অবতীর্ণ হওয়ার সময়টা হলো নবম হিজরীর যিলক্বদ মাস বা তার কাছাকাছি সময়। এ বছর নবী করীম (সাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ) কে **আমীরুল হজ্ব** বা হজ্ব যাত্রীদের নেতা করে মক্কায় পাঠিয়েছিলেন। সেই সময় এই ভাষণটি অবতীর্ণ হয়। আর তাই নবী করীম (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ) কে এ ভাষণটি হাজীদের পাঠ করে শোনানোর জন্য মক্কায় পাঠিয়ে দিলেন। এ ভাষণে মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ছেদের ঘোষণা রয়েছে।

দ্বিতীয় ভাষণঃ ৬ষ্ঠ রুকুর শুরু হতে নবম রুকুর শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় ভাষণটি চলেছে। ইহা নবম হিজরীর রজব মাস বা তার কিছু আগে অবতীর্ণ হয়, যখন নবী করীম (সাঃ) তৎকালীন পরাশক্তি রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে তাবুক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এখানে প্রকৃত ঈমানদারদের যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং দুর্বল মুমিন এবং মুনাফিকদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে।

তৃতীয় ভাষণঃ সর্বশেষ এই ভাষণটি দশম রুকু থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত চলেছে। এটি তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরার পথে অবতীর্ণ হয়েছিলো। এই অংশে এমন কতকগুলো আয়াত রয়েছে যা বিভিন্ন সময় অবতীর্ণ হয়। বিভিন্ন অংশের বিষয় একই হওয়ার কারণে অহীর নির্দেশে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এই ভাষণের সাথে সংযোগ করে দেন। এতে মুনাফিকদেরকে

www.icsbook.info

তাম্বীহ করা হয়েছে এবং তাবুক যুদ্ধে না যেয়ে যারা পেছনে রয়ে গিয়েছিলো তাদেরকে ভর্ৎসনা করা হয়েছে। আর যেসব লোক ঈমানদার হওয়া সত্ত্বেও জিহাদে অংশ গ্রহণ হতে বিরত ছিলো তাদের ক্ষমার ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

সূরার বিশেষ দিকঃ তিনটি ভাষণ নাযিল হওয়ার ধারাবাহিকতার দৃষ্টিতে প্রথম ভাষণটির স্থান সূরার সব শেষে হওয়া উচিৎ ছিলো। কিন্তু বিষয়বস্তুর গুরুত্বের দৃষ্টিতে উহার স্থান সর্বপ্রথম হওয়ার কারণে নবী করীম (সাঃ) সূরাতে সংযোজনকালে উহাকেই প্রথমে রেখেছেন। তবে যা কিছু করা হয়েছে ওহীর নির্দেশেই করা হয়েছে।

সূরার বিষয়বস্তুঃ

● সূরার প্রথম অংশে অর্থাৎ ২৮ নম্বর আয়াত পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলমানদেরকে মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা বলা হয়েছে।

● দ্বিতীয় অংশে অর্থাৎ ২৯ থেকে ৩৫ নম্বর আয়াতে আহলে কিতাব তথা ইহুদী নাসারাদের সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের সম্পর্ক ছেদের কথা বলা হয়েছে।

● তৃতীয় অংশে অর্থাৎ ৩৮ থেকে ৪১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে তাবুক যুদ্ধে যাবার জন্যে সাধারণ নির্দেশ আসার পরও যারা দূর্বলতা ও অলসতার কারণে পেছনে থেকে গেছে এবং যুদ্ধে যায়নি তাদের সমালোচনা করা হয়েছে।

● চতুর্থ অংশ এটি সবচেয়ে দীর্ঘ এবং সূরার অর্ধেকেরও বেশী অংশ জুড়ে বিস্তৃত। এ অংশে মুনাফিকদের সমালোচনা, ভর্ৎসনা, মুসলিম সমাজে তাদের অপতৎপরতার নিন্দা ও তিরস্কার করা হয়েছে। তাদের মানসিক এবং বাস্তব বিবরণ পেশ ও জেহাদ থেকে তাদের পিছু হঠার ছল-ছুঁতো, ওযর-বাহানা এবং দুরভিসন্ধির স্বরূপ উদঘাটন করা হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ, ভুল বুঝাবুঝি ও কাপুরুষতার বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা এবং রাসূল (সাঃ) ও নিষ্ঠাবান মুমিনদের নানাভাবে কষ্ট দেয়া ও উত্যক্ত করার বিবরণ দেয়া হয়েছে। সেই সাথে মুনাফিকদের চক্রান্ত থেকে নিষ্ঠাবান মুসলমানদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। মুসলমান ও মুনাফিকদের মধ্যে সম্পর্ক ছেদ এবং তাদের কার্যকলাপ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে।

www.icsbook.info

● পঞ্চম অংশে মদীনার ইসলামী সমাজের সবচেয়ে শক্তিশালী জনবল আনসার ও মোহাজের ছাড়াও তাদের চারপাশে আরও কিছু দল ও শ্রেণী ছিলো যেমন বেদুঈনরা। তাদের ভেতর নিষ্ঠাবান মুমিন, মুনাফিক ও দূর্বল মু'মিন ছিলো। সাথে মদীনাবাসী মুনাফিকও ছিলো। অনরূপ আরো একটি দল এমন ছিলো, যাদের মধ্যে সৎকাজ ও অসৎ কাজের মিশ্রণ ঘটেছিলো এবং যাদের চরিত্রে ইসলামের মজবুত প্রভাব ছিলো, তবে তাদের ইসলামের প্রতি তেমন গভীর আকর্ষণ ছিলো না। আরো একটি দল ছিলো, যাদের প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানতো না। তাদের পরিনাম কি হবে তা আল্লাহ্ই জানেন। আরো একটি দল ছিলো যারা ইসলামের নামে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকতো। সূরাতে এসব দল ও শ্রেণী সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। মুসলিম সমাজে এদের সাথে কি ধরনের আচরণ করতে হবে, তা জানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং রাসূল (সাঃ) ও একনিষ্ঠ মুসলমানদেরকে এদের সবার সাথে আচরণের কি পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে, তাও শিখিয়ে দেয়া হয়েছে। । এই অংশ ৯৭-১১০নম্বর আয়াত পর্যন্ত চলেছে।

● ষষ্ঠ অংশে আল্লাহ্র সাথে মুমিনদের ওয়াদা, এই জিহাদের ধরণ এবং মদীনাবাসী ও তার আশ-পাশের বেদুঈনদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আরো বলা হয়েছে, মদীনাবাসীদের এটা বৈধ নয় যে, তারা আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জীবন রক্ষার ব্যাপারে উদাসীন হয়ে কেবল নিজেই ব্যস্ত থাকবে। তাছাড়া মুশরিকদের সাথে মুমিনদের সম্পর্ক ছেদের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ অংশে এক পর্যায়ে এমন কয়েকজন মুমিনদের যুদ্ধে অনুপস্থিতির ঘটনা ও তার শাস্তি বিধানের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, যারা খাঁটি মুমিন ছিলেন। এই অংশ ১১১-১২৭ নম্বর আয়াত পর্যন্ত চলেছে।

● সূরার সবশেষে উপসংহারে রাসূল (সাঃ)-এর গুণাবলীর বর্ণনা দেয়া হয়েছে এবং তাঁকে একমাত্র আল্লাহ্র উপরই নির্ভরশীল হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এটা ১২৮ থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত চলেছে।

দারসের জন্য তিলাওয়াতকৃত আয়াত দুটির বিষয়বস্তুঃ এখানে প্রকৃত

www.icsbook.info

মুসলমানদের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য ও পাউনা হওয়া উচিৎ জান্নাত তা বলা হয়েছে। আল্লাহ্র সাথে মুমিনদের বায়আত বা চুক্তির কথা বলা হয়েছে এবং মুমিন মুজাহিদদের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

শানে নযূলঃ অধিকাংশ মুফাসসিরদের মতে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে **বায়আতে আকাবায়** অংশগ্রহণকারী লোকদের ব্যাপারে। এ বায়আত নেয়া হয়েছিলো হিজরতের পূর্বে হজ্ব মৌসুমে আগমকারী ইয়াসরীব (মদীনা) বাসীদের কাছ থেকে। তাই সূরাটি মাদানী হওয়া সত্ত্বেও এ আয়াতগুলোকে মাক্কী আয়াত বলা হয়েছে।

বায়আতে আকাবাঃ "আকাবা" বলা হয় পর্বতাংশকে। আকাবা বলতে বুঝায় মিনার জমরায়ে আকাবার সাথে মিলিত পর্বতাংশকে। ইয়াসরীব (মদীনার পূর্ব নাম) থেকে আগত হাজীদের কাছ থেকে তিন দফায় বায়আত নেয়া হয়। ইসলামের ইতিহাসে একেই **বায়আতে আকাবা** বলা হয়।

প্রথম বায়আতঃ প্রথম দফা বায়আত নেয়া হয় নবুওয়াতের একাদশ বর্ষে। হজ্বের মওসুমে এসময় মদীনার ৬ জন লোক গোপনে আকাবায় রাসূল (সাঃ) এর কাছে বায়আত গ্রহণ করেন। এরা মদীনায় ফিরে গিয়ে ঘরে ঘরে ইসলাম ও রাসূলের (সাঃ)দাওয়াত দেন।

দ্বিতীয় বায়আতঃ পরের বছর অর্থাৎ নবুওয়াতের দ্বাদশ বর্ষে হজ্বের মৌসুমে ১২ জন মদীনাবাসী আকাবায় একত্রিত হয়ে রাসূলের হাতে বায়আত নেন। এদের মধ্যে পূর্বের ৫ জন এবং নতুন ৭ জন ছিলেন। এই বায়আতকে ইসলামের ইতিহাসে **দ্বিতীয় বায়আত** বলা হয়। এবারে তারা রাসূল (সাঃ) এর কাছে আবেদন জানান যে, ইয়াসরীব বাসীদের কুরআনের তায়ালীম (শিক্ষা) দেবার জন্য একজন মুয়াল্লিম (শিক্ষক) পাঠানো হোক। এতে মহানবী (সাঃ) তাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে সাহাবী মুসআব বিন ওমাইর (রাঃ) কে তাদের সঙ্গে পাঠান। তিনি সেখানে গিয়ে ব্যাপক ভাবে ইসলামের দাওয়াত এবং কুরআনের তায়ালীম (শিক্ষা) দিতে থাকেন। তার ফলে ইয়াসরীব বাসীর বিপুল সংখ্যক জনগণ ইসলামে সামিল হয়ে যায়।

তৃতীয় বায়আতঃ অতঃপর নবুওয়াতের ১৩তম বর্ষে ৭০জন পুরুষ ও ২

www.icsbook.info

জন মহিলা সহ মোট ৭২জন হজ্বের মৌসুমে আকাবায় একত্রিত হয়ে নবী করীম (সাঃ) এর হাতে হাত রেখে বায়আত নেন। একে ইসলামের ইতিহাসে **তৃতীয় আকাবার বায়আত** বলা হয়। এই বায়আতটি ইসলামের মৌলিক আকিদা ও আমল, বিশেষ করে কাফেরদের সাথে জিহাদ এবং মহানবী (সাঃ) মদীনায় গেলে তাঁর হেফাজত ও সাহায্য সহযোগীতার জন্য নেয়া হয়। বায়আত নেওয়ার সময় সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা (রাঃ) বলেছিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ)! এখন ওয়াদা নেয়া হচ্ছে; আপনার রব কিংবা আপনার সম্পর্কে কোনো শর্ত থাকলে তা তাদেরকে পরিস্কার করে বলে দেয়া হোক। তখন হুজুর (সাঃ) বললেনঃ আল্লাহ্র ব্যাপারে শর্ত হলো এই যে, তোমরা সবাই তাঁরই ইবাদত করবে, তাঁকে ছাড়া আর কারও ইবাদত করবে না। আর আমার নিজের ব্যাপারে শর্ত হলো এই যে, তোমরা আমার হেফাজত করবে যেমন ভাবে নিজের জান-মাল ও সন্তানদের হেফাজত করো। তখন তারা আরয করলেন, এ শর্ত দু'টি পূরণ করলে তার বিনিময়ে আমরা কি পাবো ? প্রতিউত্তরে তিনি বললেনঃ এর বিনিময়ে তোমরা জান্নাত পাবে। তারা পুলকিত হয়ে বললেনঃ আমরা এর জন্য রাযী। এমন রাযী যে, নিজেদের পক্ষ থেকে এ চুক্তি রহিত করার আবেদন কোনো দিনই করবো না এবং রহিত করাকে প্রছন্দও করবো না। তখনই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

মহানবী (সাঃ) এর মক্কায় অবস্থানকালে জিহাদের এই আয়াত ছাড়া কোনো আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। তবে এর আমল শুরু হয় হিজরতের পরে। এরপর জিহাদের দ্বিতীয় আয়াত নাযিল হয় হিজরতের পর সূরা হজ্বের ৩৯ নম্বর আয়াত।

ব্যাখ্যাঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা তওবার তিলাওতকৃত অংশের প্রয়োজনীয় বিবরণ পেশ করলাম। এখন আপনাদের সামনে আয়াত দুটির সংক্ষেপে ব্যাখ্যা পেশ করছি।

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ط

নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা মুমিনদের জানমাল জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন।

আল্লাহ্ পাক আয়াতটি এমন এক প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ করে মুমিনদের জান্নাত দেওয়ার পাকা-পোক্ত ওয়াদা করছেন, যখন-তাঁর হাবীব মুহাম্মদ(সাঃ) কে নিজ জন্মভূমির মক্কার কঠোর দেলের কাফের-মুশরিকরা আর মোটেই বরদাস্ত করতে পারছিলো না। এমনকি তারা তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য চিন্তা-ভাবনা শুরু করে দিয়েছিলো। তাঁর দলের লোকদের ইসলাম কবুল করার অপরাধে নির্যাতনের মাত্রা এমন চরম পর্যায়ে পৌছিয়ে গিয়েছিলো যে, মহানবী (সাঃ) তাদেরকে আবিসিনিয়ায় হিজরত করার অনুমতি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁর নবুয়াতের দায়িত্ব পালনের সহযোগিনী, বিপদের সাথী, চির সঙ্গিনী খাদিজাতুল কোবরা (রাঃ) এবং তাঁর আশ্রয়দাতা চাচা আবু তালিবের মৃত্যুর পর মক্কার কোনো ব্যক্তি তাঁকে আশ্রয় দেবার মতো হিম্মত রাখছিলো না এবং বহীর দেশেও তাঁকে আশ্রয় দিতে সাহস পাচ্ছিলো না। কেননা, মক্কার কাফেরদের আক্রমণের সমূহ আশংকা ছিলো। এমতাবস্থায় ইয়াসরীব (মদীনার পূর্বনাম) বাসীরা মহানবীকে (সাঃ) শুধু আশ্রয়ই নয় বরং তাঁকে তাদের দেশের নেতা বানানোর জন্য এগিয়ে আসেন এবং হিজরতের পূর্বে হজ্বের মওসুমে মক্কায় আগমন করে আকাবা নামক স্থানে পর পর তিন বছরে তিনবার রাসূলের কাছে বায়আত গ্রহণ করে ইসলাম কবুল করেন এবং চূড়ান্ত বায়আত যাকে তৃতীয় বায়আতে আকাবা বলা হয়) ইয়াসরীবে যাবার জন্য তারা রাসূল (সাঃ)কে আমন্ত্রণ জানান। রাসূল (সাঃ) তাদের দেশে গেলে তাদের জন্য যে চরম ঝুঁকি আছে তা তাদেরকে জানিয়ে দেন। তাঁরা সকল প্রকার ঝুঁকি জান-প্রাণ দিয়ে মোকাবেলা করবেন বলে রাসূল (সাঃ)কে আশ্বস্তঃ করেন। তাছাড়া মদীনায় যাবার ব্যাপারে যদি কোনো শর্ত থাকে তাও আরোপ করার জন্য রাসূল (সাঃ) কে তারা আহবান জানান। এতে রাসূল (সাঃ) বেশ কিছু শর্তের সাথে মৌলিক দু'টি শর্ত আরোপ্ করেন। তা হলো, আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো এবাদত করবে না এবং নিজের জীবন রক্ষার জন্য যে সব ঝুঁকি গ্রহণ করে থাকে তারা তাঁর জীবন রক্ষার জন্যও সেরকম জীবনের

ঝুঁকি নেবে কি না ? তারা স্বতস্ফূর্তভাবে শর্ত দু'টি মেনে নিতে রাযি হয়ে যায় এবং এসব শর্ত পূরণ করলে বিনিময়ে কি পাওয়া যাবে তা জানতে চায় ? প্রতিউত্তরে রাসূল (সাঃ) বলেনঃ এর বিনিময়ে জান্নাত পাওয়া যাবে। জান্নাত পাবার আশায় মদীনাবাসী মুমিনগণ শর্ত ভঙ্গ না করার অঙ্গিকারবদ্ধ হন। তখন আল্লাহ্ পাক মুমিনদের চূড়ান্ত বায়আত গ্রহণের কারণে তাঁর পক্ষ থেকে সুসংবাদ জানিয়ে বলেনঃ **নিশ্চয় আল্লাহ্ মুমিনদের জান-মাল জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন।**

আয়াতাংশে রাসূলের সাথে নয় বরং আল্লাহ্র সাথেই মুমিনদের কেনা-বেচারচুক্তি হয়েছে। মাধ্যম হচ্ছেন আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ)। ক্রয়কারী হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা আর বিক্রয়কারী হচ্ছে মুমিনেরা। বিনিময় হচ্ছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে জান্নাত, আর মুমিনদের পক্ষ থেকে তাদের জীবন এবং ধন-সম্পদ।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, জান্নাত এবং মানুষের জান-মাল সব কিছুই তো আল্লাহ্ তাআলার। সেখানে কেনা বেচার তো কোনো প্রশ্নই উঠে না। আসল কথা হলো আল্লাহ্ তাআলা অপরের হক বা অধিকারে হস্তক্ষেপ করেন না। যখন মানুষকে তার জীবন এবং ধনসম্পদ দান করেছেন তখন থেকে তা ব্যবহার করা তার এখতিয়ারভুক্ত হয়ে গেছে।

অধিকার দু'প্রকারঃ একটি আল্লাহ্র অধিকার যাকে -حَقُّ اللّٰهِ বলা হয়, অপরটি বান্দার অধিকার যাকে حَقُّ الْعِبَادْ- বলা হয়।

হাদীসে এসেছে- হাশরের মাঠে বিচারের সময় অধিকারের প্রশ্নে বান্দা যদি আল্লাহ্র অধিকারে হস্তক্ষেপ করে থাকে তবে আল্লাহ্ তাকে মাফ করতে পারেন আবার নাও করতে পারেন। কিন্তু কোনো বান্দা যদি কোনো বান্দার অধিকারে হস্তক্ষেপ করে থাকে তাহলে সেই বান্দা দুনিয়াতে তাকে মাফ না করা পর্যন্ত আল্লাহ্ তাকে মাফ করবেন না।

যেহেতু মানুষের জান এবং ধন-সম্পদ حَقُّ الْعِبَادْ বা বান্দার অধিকারভুক্ত, তাই তিনি এ বিষয়টি বান্দার স্বাধীনতার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। তবে তিনি তার অধিকার প্রয়োগের কল্যাণ-অকলাণের পথও

বাতলিয়ে দিয়েছেন। তাকে সে জ্ঞান বুদ্ধিও দিয়ে দিয়েছেন।

মুমিনদের জন্য বিনিময় বস্তু এক বড় নেয়ামতঃ আল্লাহ্ এবং মুমিনদের মধ্যে যে পণ্যের বিনিময়ে কেনা-বেচার চুক্তি হচ্ছে তা হলো- আল্লাহ্র পক্ষ থেকে স্থায়ী জান্নাত এবং মুমিনদের পক্ষ থেকে অস্থায়ী জান-মাল। মুমিনদের এই তুচ্ছ এবং ক্ষণস্থায়ী জীবন ও ধন-সম্পদের বিনিময়ে তারা পাচ্ছে- আল্লাহ্র নেয়ামতে ভরা অতীব মূল্যবান চিরস্থায়ী জান্নাত। এটা মুমিনদের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এক বড় নেয়ামত। আর এ নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার মাধ্যম হলো, আল্লাহ্র পথে জান-মাল দিয়ে জিহাদ করা।

আমানত রক্ষা করাঃ আল্লাহ্ তাআলা তাঁর জান্নাতের বিনিময়ে মুমিনদের জান-মাল খরিদ করে নিয়ে আবার তাদের কাছেই আমানত হিসেবে রেখে দিয়েছেন। এখন যেসব মুমিন জান্নাত পেতে চায়, জান্নাত লাভই তাদের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হয় এবং যারা এই চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য আল্লাহ্র সাথে জান-মাল দিয়ে চুক্তিতে আবদ্ধ, তাদের তো জান-মাল আমানত হিসেবেই জমা আছে। এখন সে আর নিজের ইচ্ছেমত খরচ ব্যবহার করতে পারে না। যেহেতু আল্লাহ্রই ক্রয়কৃত মাল সেহেতু আল্লাহ্ যখন যখন চাইবেন, বান্দাহ্ তখন তখন দিতে বাধ্য থাকবেন। কোনো প্রকার টালবাহানা করতে বা দিতে অস্বীকার করতে পারবেনা। যদি এ ধরনের কোনো আচরণ করা হয় তা হবে আমানতের স্পষ্ট খেয়ানত। খেয়ানত করা হলো ঈমান বহির্ভূত কাজ। এ সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ

لَاإِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَنَتَالَهُ **তার ঈমান নেই যার আমানত দারী নেই।** যার চূড়ান্ত পরিণতি হবে জান্নাত তো নয়ই বরং জাহান্নাম।

আমানত রক্ষার মাধ্যমঃ মুমিনের কাছে আল্লাহ্র ক্রয়কৃত জান-মালের আমানত রক্ষার মাধ্যমই হলো **জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ্** বা আল্লাহ্র পথে জিহাদ বা ইসলামী আন্দোলন। কেননা, জিহাদ বা ইসলামী আন্দোলনেই প্রয়োজন হয় জান-মাল খরচ করার। এই পথ ছাড়া অন্য কোন পথে জান-মাল খরচ করার প্রয়োজন হয় না। ইসলামী আন্দোলন করলেই

www.icsbook.info

তো ইসলাম বিরোধী তাগুতি শক্তি বাধা সৃষ্টি করে। আর বাধা সৃষ্টি হলেই লড়াইয়ের প্রশ্ন আসে। আর লড়াইয়ের প্রশ্ন আসলেই জান-মাল খরচের প্রশ্ন আসে।

বায়আত সম্পর্কে ধারণাঃ

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জীবনকালেঃ আল্লাহ্‌র নবীর জীবনকালে সাহ-াবাগণ বিভিন্ন সময় তার হাতে হাত রেখে বায়আত গ্রহণ করেন। যেমন **বায়আতে আকাবা, বায়আতুস্ সাজারা** (হুদাই বিয়ার সন্ধির বায়আত) ইত্যাদি। এই বায়আত ছিলো রাসূল (সাঃ)-এর হাতে হাত রেখে নিজের জান-মালকে আল্লাহ্‌র পথে বিলিয়ে দেবার শপথ।

খেলাফত কালেঃ রাসূল (সাঃ) এর ওফাতের (মৃত্যুর) পর সাহাবাগণ খেলাফতের যুগে হাতে হাত রেখে খেলাফতের আনুগত্যের বায়আত গ্রহণ করেছেন। যেমন প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ) এর হাতে হাত রেখে হযরত ওমর (রাঃ) প্রথম খেলাফতের আনুগত্যের বায়আত গ্রহণ করেন। তার পর উপস্থিত সকলেই বায়আত গ্রহণ করে খেলাফতের আনুগত্য প্রকাশ করেন। তবে তারা সকলেই রাসূলের যুগেই জান-মাল আল্লাহ্‌র পথে বিলিয়ে দেবার বায়আতে আবদ্ধ ছিলেন।

প্রচলিত বায়আতঃ বর্তমান সময়ে হাতে হাত রেখে অথবা পিঠ ছুঁয়ে অথবা পরস্পর পাগড়ী ধরে যে বায়আতের প্রচলন আছে তা ইসলামের দৃষ্টিতে কোনো বায়আতের মধ্যেই পড়ে না। এই বায়আত শরীয়ত সম্মত নয়।

শরীয়ত সম্মত বায়আতঃ একজন মুমিনের ঈমানের প্রাথমিক দাবীই হলো জান্নাত লাভের উদ্দেশ্যে নিজের জান-মালকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় বিলিয়ে দেবার জন্য বায়আতে আবদ্ধ হওয়া। আর এই বায়আত গ্রহণের পদ্ধতিই হলো ইসলামী আন্দোলন বা সংগঠনের কাছে দ্বীন কায়েমের জন্য খালেস নিয়াতে নিজের জান-মালকে খরচ করার জন্য বায়আত গ্রহণ করা। এ বায়আত কোনো ব্যক্তির কাছে হবে না এবং কারো হাতে হাত রাখাও যাবে না বরং সংগঠনের কাছেঃ

إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার কুরবাণী, আমার জীবন এবং আমার মরণ একমাত্র বিশ্ব প্রভু আল্লাহ্‌র জন্য এই বাক্য পাঠের মাধ্যমে শপথ গ্রহণ করে নিজের জান-মালকে সোপর্দ করে দিতে হবে। এই বায়আতে আবদ্ধ হওয়া হলো প্রতিটি মুমিনের জন্য অবশ্যই করণীয় কর্তব্য। কেননা বায়আতবদ্ধ জীবন যাপন না করলে মুমিনের চূড়ান্ত লক্ষ্য জান্নাত লাভ করা সম্ভব নয়।

বাকিতে জান্নাতঃ আল্লাহ্‌র সাথে মুমিনদের যে বিনিময়ের চুক্তি। তা হলোঃ মুমিনেরা নগদে খরচ করবে অথচ বাকিতে জান্নাত পাবে। এর কারণ হলো, আল্লাহ্ পরীক্ষা করে দেখতে চান যে, মুমিনেরা-জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার চুক্তিতে টিকে থাকতে পারছে কি না। কেননা, একজন মুমিনকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আল্লাহ্‌র দ্বীন আন্দোলনে প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে টিকে থাকতে হবে। মুমিন জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ইসলামের পথে লড়তে গিয়ে হয় শহীদ হবে, নয় তো গাজী হিসেবে বেঁচে থাকবে।

অতঃপর আল্লাহ্‌পাক বায়আত গ্রহণ কারীদের করণীয় সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেনঃ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ **(বায়আত গ্রহণের পর) তারা আল্লাহ্‌র পথে লড়াই করে, অতঃপর (কাফেরদের) হত্যা করে এবং (নিজেরাও) নিহত হয়।**

এখানে আল্লাহ্‌পাক وَيُقْتَلُوْنَ বলে জিহাদের চূড়ান্ত পর্যায় অর্থাৎ শত্রুদের সাথে সরাসরি লড়াই এর কথা বলেছেন। যদিও এই শব্দ কোনো কোনো ক্ষেত্রে জিহাদ বা আন্দোলন অর্থেও ব্যবহৃত হয়। পরবর্তী শব্দ দু'টি তারা মারে এবং মরে, এটা সম্মক সমরেই (যুদ্ধে) সংঘটিত হয়।

একজন মুমিন বান্দাহ্ নিজের জান-মালের বিনিময়ে জান্নাত লাভের চুক্তি সম্পাদন করার পর বাড়ীতে, খানকায় বা মসজিদে বসে থাকলে চলবে না। তাকে অবশ্যই **জিহাদ ফিসাবিলিল্লাহ্** বা **ইসলামী আন্দোলনে** জড়িত থাকতে হবে। আর যখনই সে আন্দোলনে জড়িত থাকবে তখনই খোদাদ্রোহী তাগুতি শক্তির বাধার সম্মুখীন হবে। বাধা আসলেই তখন জান-মাল খরচের প্রশ্ন আসবে। প্রয়োজনে সে শত্রুর মোকাবেলায় যুদ্ধে

অবতীর্ণ হয়ে কাফের-মোশরেক এবং খোদাদ্রোহী শক্তিকে প্রতিহত করতে গিয়ে তাদেরকে হত্যা করবে, অপর পক্ষে বিরোধীদের আক্রমণে পিছপা না হয়ে বরং নিজের জীবন দান করে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবে। আল্লাহ্পাক বায়আত গ্রহণকারী মুমিন মুজাহীদদের কাছ থেকে এ ধরনের চূড়ান্ত আমলই কামনা করেন।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! লক্ষ্য করুন, প্রচলিত পীরের কাছে বায়আত গ্রহণকারীদের কি উপরোক্ত ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হয় ? বরং তাদেরকে বাতিল শক্তি সহায়তা করে থাকে। নানা ধরনের দামী দামী হাদীয়া পাঠিয়ে থাকে। তাদের কর্মসূচীর মধ্যে কি দ্বীন কায়েমের কোনো কর্মসূচী পাওয়া যায় ? তাদের কি যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয় ? তাদের জীবনে কি কাফের মারা এবং নিজেদের মরার কোনো সুযোগ হয় ?

অপর পক্ষে দেখা যাচ্ছে বর্তমান যুগেও আল্লাহ্র দ্বীন কায়েমের কর্মসূচী নিয়ে যারা ইসলামী দলের কাছে নিজের জান-মাল আল্লাহ্ রাস্তায় বিলিয়ে দেবার জন্য বায়আত গ্রহণ করে। তখন তাদেরকেও তাগুতি শক্তির মোকাবেলায় ইসলামী আন্দোলনে সব ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এমনকি শেষ পর্যন্ত নিজের জীবন দান করে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করছে।

অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা মুজাহীদদের সাথে তার চুক্তি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেনঃ

وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ

তাদেরকে এই (জান্নাত দানের প্রতিশ্রুতি আসমানি কিতাব তাওরাত, ইঞ্জিল ও এই কোরআনেও তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল।

আল্লাহ্ পাক মুমিনদের জান-মালের বিনিময়ে জান্নাত দেবার যে খাঁটি ওয়াদা করেছেন, শুধু তিনি এই কোরআনেই করেননি বরং এর আগের আসমানী কিতাব তাওরাত এবং ইঞ্জিলেও করেছিলেন।

অবশ্য বর্তমানে তাওরাত এবং ইঞ্জিল যে অবস্থায় আছে সেখানে ইঞ্জিলে এই বিষয়টি কিছু উল্লেখ থাকলেও তাওরাত কিতাবে মোটেও উল্লেখ পাওয়া যায় না। কেননা বর্তমানে তাওরাত এবং ইঞ্জিলের যে অস্তিত্ব

পাওয়া যায়, তা ইহুদী এবং নাসারাদের প্রায় ৯০ ভাগই মনগড়া কথা। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আল-কুরআনকে অবিক্রীত অবস্থায় সংরক্ষণের জন্য আল্লাহ্‌পাক স্বয়ং যেভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, অনুরূপ দায়িত্ব আগের আসমানি কিতাব সমূহের ক্ষেত্রে গ্রহণ করেননি। আর দুনিয়াতেও তা সঠিক ভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়নি। একজন খাঁটি মুমিনের উচিত হবে কুরআনে যা উল্লেখ আছে তা সন্দেহাতীত ভাবে বিশ্বাস করা। সুতরাং তাওরাত এবং ইঞ্জিলে জান্নাত দেবার যে খাঁটি ওয়াদা আল্লাহ্ পাক করেছেন তা বর্তমানে দেখতে পাওয়া না গেলেও বিশ্বাস করা। কেননা আল্লাহ্‌পাক তাঁর পরিপূর্ণ কিতাব আল-কুরআনে তা উল্লেখ করেছেন।

অতঃপর আল্লাহ্‌পাক তাঁর ওয়াদা পূরণ সম্পর্কে বলেনঃ

وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ

আর আল্লাহ্‌র চেয়ে ওয়াদা পূরণ করতে কে বেশী পারে ?

ওয়াদা রক্ষার বিষয়ে যাতে কারও মধ্যে সামান্যতম সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি হতে না পারে, তার জন্য আল্লাহ্‌পাক ঘোষণা দিচ্ছেন- মুমিনেরা ওয়াদা খেলাপ করলেও তিনি তাঁর ওয়াদা পূরণ করবেনই। তাঁর চেয়ে ওয়াদা পূরণ কারী আর কেউ হতে পারে না। আল্লাহ্‌র ওয়াদা পূরণ সংক্রান্ত বিষয়টি জোর দেবার জন্যই প্রশ্নের মাধ্যমে কথাটি উল্লেখ করেছেন।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক আয়াতের শেষ অংশে মুজাহীদদের সুসংবাদ এবং প্রতিদানের কথা বলতে গিয়ে বলেন ঃ

فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ط وَذٰلِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

অতএব তোমরা রাজী-খুশী হয়ে যাও সেই লেন-দেনের জন্যে, যা তোমরা তাঁর সাথে করেছো। আর এটাই হলো (তোমাদের জন্য) বড় সফলতা।

আল্লাহ্ তাআলার সাথে মুমিন বান্দাহ্ জান্নাতের বিনিময়ে জান-মাল, লেন-দেনের যে চুক্তি করেছে এর জন্য আনন্দ প্রকাশ করা উচিত।

www.icsbook.info

কেননা, মুনিনেরা এমন এক নেয়ামতে ভরা স্থায়ী জান্নাতের বিনিময়ে ক্ষণস্থায়ী জান-মালের বিনিময় করেছে, যা মুমিনদের জন্য এক অতি বড় নেয়ামত। প্রকৃতপক্ষে একজন মুমিনের সবচেয়ে বড় এবং চূড়ান্ত সফলতাই তো হলো জান্নাত লাভ। এর চেয়ে বড় পাওনা মুমিনদের জন্য আর কিছু হতে পারে না। মুমিন জীবনের চূড়ান্ত লক্ষই হলো আখেরাতে নাজাতের মাধ্যমে জান্নাত লাভ।

বায়আত গ্রহণকারী মুজাহীদদের করণীয় কর্তব্য এবং তাদের চূড়ান্ত সফলতার কথা উল্লেখের পর আল্লাহ্ পাক মুমিন মুজাহীদদের বাস্তব জীবনের কতকগুলো গুণ বা বৈশিষ্টের কথা উল্লেখ করে বলেনঃ-

اَلتَّائِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّائِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ

(মুজাহীদদের গুণাবলী হলোঃ) তারা তাওবাকারী, এবাদতকারী, প্রশংসাকারী, (দ্বীনের পথে) ভ্রমণকারী, রুকু সেজদাহ্ আদায়কারী, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা দানকারী এবং আল্লাহ্র (শরীয়তের) সীমা রক্ষাকারী। (হে নবী এসব গুণের অধিকারী) মুমিনদের (জান্নাতের) সুসংবাদ জানিয়ে দিন।

অত্র আয়াতে আল্লাহ্পাক বায়আত গ্রহণকারী মুমিনদের মৌলিক ৭টি গুণের কথা উল্লেখ করেছেন, যা মুমিন মুজাহীদদের মধ্যে থাকা অতীব জরুরী। নিম্নে ধারাবাহিক ভাবে তা উল্লেখ করা হলোঃ

এক. اَلتَّائِبُوْنَ- তারা তাওবাকারীঃ তাওবার অর্থ হলো মন্দ কাজ থেকে ভালোর দিকে ফিরে আসা। মানুষ ভূল-ক্রুটির উর্দ্ধে নয়। কম হোক বেশী হোক মানুষ ভুল করে থাকে। এজন্য একজন মুমিন মুজাহীদের বৈশিষ্ট্যই হবে ভুল-ক্রুটির জন্য বার বার তাওবা করা। ভুল হলেই এস্তেগফার করা। **তাওবাতুন্ নাসুহা** বা গ্রহণযোগ্য তাওবার নিয়মই হলোঃ (১) বান্দাহ্ যে ভুল করেছে তার স্বীকৃতি দেয়া এবং লজ্জিত হওয়া। (২) সেই ভুলের জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং

www.icsbook.info

(৩) সে ভুল আর করবে না এই বলে স্বীকৃতি দেওয়া।

মহানবী (সাঃ) এর অভ্যাসই ছিলো, প্রতিদিন ৭০ থেকে ১০০ বার পর্যন্ত তাওবা বা এস্তেগফার করা। সুতরাং একজন মুমিন মুজাহীদের প্রথম গুণই হবে বার বার তাওবা করা।

দুই. اَلْعٰبِدُوْنَ **তারা এবাদতকারীঃ** অর্থাৎ মুমিন মুজাহীদদের দ্বিতীয় গুণ হবে-একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহ্ তাআলারই এবাদত গুজারী করা। এবাদতের অর্থ হলো, প্রতিটি কথা-কাজ, 'পদক্ষেপ এবং তৎপরতা আল্লাহ্র বিধানের অনুকূলে হওয়া। আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও আনুগত্য না করা। আনুষ্ঠানিক এবাদত-বন্দেগী করলে খালেছ দেলে একনিষ্ঠভাবে তা আদায় করা। যেখানে থাকবেনা কোনো লৌলিকতা। এবাদতের নিয়ম প্রসংগে বলতে গিয়ে **হাদীসে জীবরিলে** মহানবী (সাঃ) জীবরাঈল (আঃ)-এর এহ্সান সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেনঃ

اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهٗ يَرَاكَ

তুমি যখন আল্লাহ্র এবাদত করবে তখন যেন স্বয়ং আল্লাহ্কে (হাজির-নাজির) দেখতে পাচ্ছো। আর যদি এটা সম্ভব না হয়, তবে মনে করতে হবে যে, আল্লাহ্ তোমাকে সর্বক্ষণ দেখছেন। (রাবী হযরত ওমর, মুসলিম শরীফ।)

তিন. اَلْحٰمِدُوْنَ **তারা প্রশংসাকারীঃ** মুমিন মুজাহীদদের তৃতীয় গুণ হবে, তারা সুখের অবস্থায় হোক আর দুঃখের অবস্থায় হোক আল্লাহ্র প্রশংসাকারী। তাঁর অসংখ্য নেয়ামত ভোগ-ব্যবহারের জন্য শুকোর আদায়কারী। তারা শুধু সুখ এবং ভাল অবস্থায় শুকরিয়া আদায় করে না, বরং দুঃখ এবং বিপদের সময়েও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পরীক্ষা মনে করে সবর করে। সে মনে করে এর মধ্যেই কোনো কল্যাণ নিহীত আছে, যা তার জানা নেই, কিন্তু আল্লাহ্র জানা আছে। বিপদ মুসিবতে পড়লে মুমি-নদের করণীয় সম্পর্কে আল্লাহ্পাক সূরা বাকারার ১৫৬ নং আয়াতে বলেনঃ

اَلَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ–

যখন তারা (মুমিনেরা) বিপদ-মুসিবতে পড়ে, তখন বলে, নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহ্‌র জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই কাছে ফিরে যাবো।

চার. اَلسَّآئِحُوْنَ তারা (আল্লাহ্‌র পথে) ভ্রমণকারীঃ মুমিনদের চতুর্থ

এই গুণটি সম্পর্কে তাফসীরকারকগণ বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ করেছেন। কেউ বলেন এর মানে হলো মোহাজের, কেউ বলেন মোজাহেদ, কেউ বলেন দ্বীনি ইলম সন্ধানের উদ্দেশ্যে ভ্রমণকারী, আবার কেউ বলেন এর মানে রোযা পালনকারী।

اَلسَّآئِحُوْنَ শব্দটি سِيَاحَةٌ-থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ দেশ ভ্রমণ।

সুতরাং আভিধানিক অর্থের দিক থেকে দেশ ভ্রমণ নেয়াটা বেশী যুক্তিযুক্ত হবে। সুতরাং এ অর্থই যদি ধরে নেয়া হয় তাহলে এর অর্থ খালি খালি দেশ-বিদেশে ঘোরাফেরা করা নয়। যাতে আল্লাহ্‌র কোনো সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্য থাকে না। বরং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্যে দ্বীনি ইলমের সন্ধান, দ্বীনের দাওয়াত এবং প্রচার, দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার জিহাদ, প্রয়োজনে হিজরাত, সমাজ সংস্কার ও সংশোধন, আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী দেখা এবং হালাল রুযি তালাশের জন্য দেশ-বিদেশে ভ্রমন করা।

এ গুণটি মুমিনদের জন্য একটি বিশেষ গুণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে এজন্য যে, যেসব লোক ঈমানের দাবীদার হবার পরেও জিহাদের ডাকে সাড়া দেয় না, ঘরের বাইরে বের হতে চায় না, তাদেরকে বলা হচ্ছে- প্রকৃত মুমিন ব্যক্তি ঈমান আনার পর মুখে শুধু ঈমানের দাবী করে কোনো দিনই বসে থাকতে পারে না। বরং সে আল্লাহ্‌র দ্বীন কবুল করার পর দ্বীনের প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তার দাবি পূরণের জন্য প্রাণপন চেষ্টা সাধনায় নিয়োজিত থাকে। আর এজন্য সে যে কোনো ঝুঁকির মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত থাকে।

www.icsbook.info

পাঁচ. اَلرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ। তারা রুকু ও সেজদাহ্ আদায়কারীঃ

রুকু ও সেজদাহ্কারী বলে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা সমাজে নামাজ কায়েম করে এবং নামাজের উপর নিজেরাও কায়েম থাকে। যারা রুকু এবং সেজদাহর মাধ্যমে নিজের সমস্ত আমিত্বকে জলাঞ্জলি দিয়ে আল্লাহর সামনে মাথা নীচু করে দেয়। এখানে আরও একটি অর্থ নেয়া যায় যে, মুমিনেরা ইহুদীদের ন্যায় রুকু ছাড়া নামায আদায় করে না বরং তারা রুকু-সেজদাহ্ সহ পূর্ণভাবে নামায আদায় করে।

ছয়. اَلْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ তারা ভাল কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে বাধাদেয়ঃ মুমিন মুজাহীদদের ৬ষ্ঠ গুণ হলো তারা ভালো, কল্যাণকর ও নেক কাজে আদেশ দেয়, উৎসাহ প্রদান করে এবং ভালো কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করে। অপর পক্ষে মন্দ, অকল্যাণকর এবং গোনাহ্র কাজে বাধা সৃষ্টি করে, মন্দ কাজ করতে উৎসাহ দেয়না। বরং খারাপ কাজের পথ রোধ করে দেয়।

এই গুণটি আদায়ের জন্য যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রয়োজন তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। কেননা এখানে اَمْرٌ (আমর) বা নির্দেশ বাচক শব্দ উল্লেখ রয়েছে। নির্দেশতো সেই দিতে পারে, যার হাতে ক্ষমতা থাকে। এজন্য ভালো কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজে বাধা সৃষ্টির জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রয়োজন।

ভালো কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজে বারণ তখনই করতে পারবে যখন মুসলমানদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থাকবে। দেশের আইন এবং সমাজ ইসলামী শরীয়াত কুরআন সুন্নাহ্ অনুযায়ী পরিচালিত হবে। ভালো কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজে বাধাদান সমাজের অংগে পরিণত হবে। কিন্তু যখন সমাজ ক্ষমতা মুসলমানদের হাতে থাকবে না, দেশের আইন ব্যবস্থা কুরআন হাদীস অনুযায়ী চালিত হবে না। তখন ঐ সমাজের মুমিনদের জন্য প্রধান ভালো কাজ হবে আল্লাহ্র যমীনে আল্লাহ্র বিধান প্রতিষ্ঠা করা। আর মন্দ কাজে বাধাদান করা হবে ইসলামী সমাজ

প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী তাগুতি শক্তিকে প্রতিহত করা এবং বিরোধী শক্তিকে নির্মূল করা।

মন্দ অসৎ এবং গোনাহর কাজকে সমাজ থেকে উৎখাত করার জন্য রাসূল (সাঃ) ঈমানের দাবী হিসেবে উল্লেখ করে বলেনঃ-

مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ

তোমাদের কেউ যখন কোনো অন্যায় ও অপরাধ হতে দেখবে, তখন যেনো সে তার হাত (ক্ষমতা) দিয়ে তা প্রতিহত করে। যদি সে একাজ করতে পরিবেশ না পায়, তখন যেনো সে তার জবান (অর্থাৎ বক্তৃতা, বিবৃতি, শ্লোগান, আলাপ-আলোচনার) দ্বারা তা প্রতিহত করে। এতেও যদি সে সক্ষম না হয়, তবে সে যেন তার অন্তর দিয়ে (ঘৃণা) করে এবং (তা প্রতিহত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে।) আর এটা হলো ঈমানের দুর্বলতম পর্যায়।

অত্র হাদীসে ঈমানের তিনটি শ্রেণী করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণীর ঈমানের দাবীই হলো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মাধ্যমে মন্দ কাজকে প্রতিহত করা।

সাত. وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ এবং তারা আল্লাহ্‌র (শরীয়তের) সীমারেখা রক্ষা করে ঃ

আয়াতে মুমিনদের সর্বশেষ গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌র দেয়া জীবন বিধান পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মেনে চলে। আল্লাহ্‌র দেয়া শরীয়তের সীমা অতিক্রম করেনা। তারা তাঁর বিধি–বিধান সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করে না। আল্লাহ্‌র শাস্তির বিধান 'হদ' এবং কেসাসকে বর্বর বা মধ্যযুগীয় বলে আখ্যায়িত করে না। তারা হালালকে হালাল হিসেবে গ্রহণ করে এবং হারামকে হারাম হিসেবে বর্জন করে।

আল্লাহ্‌র সীমা তথা তার বিধি-বিধান রক্ষা করা তখনই সম্ভব যখন সেই দেশের জনগণ ইসলামী শরীয়তের অনুশাসন মেনে চলার সুযোগ লাভ

www.icsbook.info

করে। যখন সে সমাজে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব এবং তাঁরই বিধি-বিধান কায়েম থাকে। মুমিনদের এই গুণটি অর্জনের জন্য ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার প্রয়োজন।

অতএব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আল্লাহ্র সাথে বায়আতের চুক্তি মোতাবেক নিজের জান-মাল দিয়ে আল্লাহ্র যমীনে আল্লাহ্র বিধান প্রতিষ্টার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। যারা আল্লাহ্র সাথে চুক্তি অনুযায়ী তাদের কাছে রক্ষিত আমানত জান এবং মাল খরচের জন্য আল্লাহ্র রাস্তায় দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যুক্ত থাকে, যাদের ব্যবহারীক এবং চারিত্রীক জীবনে উপরোক্ত সাতটি গুণ বা বৈশিষ্ট থাকবে তাদের জন্য খোশ খবরি জানিয়ে আল্লাহ্পাক আয়াতের সর্বশেষ অংশে বলেনঃ

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ (হে নবী) আপনি তাদেরকে অর্থাৎ মুমিন মুজাহীদদেরকে (জান্নাতের) সুসংবাদ টুকু জানিয়ে দিন।

শিক্ষাঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! উপরোক্ত আয়াত দু'টির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমাদের জন্য যেসব শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে, তা হলোঃ

❑ একজন মুমিনের জীবনের মূল এবং চূড়ান্ত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হওয়া উচিত আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং আখেরাতে নাজাতের মাধ্যমে জান্নাত লাভ করা।

❑ জান্নাত পেতে হলে রাসূল (সাঃ) এর কর্মসূচী অনুযায়ী বাস্তব এবং বিজ্ঞান সম্মত কর্মসূচী গ্রহণকারী ইসলামী জামায়াত বা সংগঠনের কাছে বায়আত গ্রহণের মাধ্যমে আল্লাহ্র রাস্তায় নিজের জান মালকে ওয়াক্ফ করে দেয়া।

❑ কোনো ব্যক্তিকে খুশি করার জন্য বায়আত গ্রহণের মাধ্যমে মুরিদ না হওয়া।

❑ সংগঠনের কাছে বায়আত গ্রহণ করার পর বাড়ীতে বসে না থেকে পূর্ণভাবে দ্বীন ইসলাম কায়েমের জিহাদে আত্মনিয়োগ করা। প্রয়োজনে তাগুতি শক্তির বিরুদ্ধে সম্মক সমরে (যুদ্ধে) ঝাঁপিয়ে পড়া।

❑ বিক্রয়কৃত জান-মাল আল্লাহ্র বা দ্বীন কায়েমের আন্দোলনে যখন যা প্রয়োজন তা সতস্ফূর্তভাবে দেওয়া। কোন প্রকারের বাহানা বা গড়িমোসি

না করা। জান এবং মালকে নিজের বলে দাবী না করা।

❑ সংগঠনের কাছে বায়আত গ্রহণকারী মুমিন মুজাহীদদের মধ্যে নিচের সাতটি গুণ বা বৈশিষ্ট থাকাঃ

১. নিজের ভুল-ক্রটির জন্য সার্বক্ষণিক ভাবে আল্লাহ্র কাছে এস্তেগফার করা। প্রতিদিন ৭০ থেকে ১০০বার মৌখিক ভাবে এস্তেগফার করা।

২. প্রতিটি মুহূর্ত এবং প্রতিটি সময় আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী নিজের জীবন পরিচালিত করা। একমাত্র আল্লাহ্র সন্তষ্টির জন্যই একনিষ্ঠভাবে এবাদত-বন্দেগী করা।

৩। **সদা সর্বদা আল্লাহ** তা'য়ালার প্রশংসা করা। সুখের অবস্থায় হোক আর দুঃখের অবস্থায় হোক আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করা। সুখ বা ভালো কাজের জন্য **আলহামদুলিল্লাহ** বলা এবং দুঃখের এবং বিপদের সময় **ইন্নালিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রাজিউন** বলে ধৈর্য ধারণ করা।

৪. আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দ্বীন ইসলামের জ্ঞান অর্জনের জন্য দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করা। দ্বীন কায়েমের জন্য জিহাদ করা, প্রয়োজনে হিজরাত করা। ফরজ এবং মাঝে মাঝে নফল রোযা পালন করা।

৫. আল্লাহ্ তাআলার পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশের জন্য নিজের জীবনে রুকু সিজদার মাধ্যমে পূর্ণভাবে নামায কায়েম করা এবং সমাজ জীবনে নামায কায়েম করার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।

৬. ভালো কাজে আদেশ এবং মন্দ কাজে বাধা দান করার জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জনের উদ্দেশ্যে ইসলামী আন্দোলনে প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখা। অনইসলামিক সমাজেও সুযোগ অনুযায়ী ভালো কাজে আদেশ এবং মন্দ কাজে বাধা দানের কাজ অব্যাহত রাখা।

৭. এই গুণটি অর্জন করার জন্যও ইসলামী রাষ্ট্রের প্রয়োজন। আল্লাহ্র

সীমা বা বিধি বিধান নিজে মেনে চলা এবং সমাজে আল্লাহ্‌র সীমা সংরক্ষণের জন্য ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জান-প্রাণ দিয়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো।

আহবানঃ সম্মানিত ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাদের সামনে সূরা তাওবার ১১১ ও ১১২ নম্বর আয়াত দু'টির যে সব বিবরণ এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পেশ করলাম এতে যদি আমার অজান্তে কোনো ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যাই তার জন্য আল্লাহ্ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর আয়াত দু'টিতে যে সব শিক্ষণীয় বিষয় আমরা জানতে পারলাম তা যেনো বাস্তব জীবনে আমল করতে পারি সেই তৌফিক কামনা করে শেষ করছি। **অয়াআখেরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন।**

www.icsbook.info

চার

মুমিনদের ছয়টি বর্জনীয় আচরণ

হুজুরাত-১১-১২ আয়াত

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاۤءٌ مِّنْ نِّسَاۤءٍ عَسٰى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ؕ بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰۤئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ - يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ

সরল অনুবাদঃ ইরশাদ হচ্ছেঃ (১১) হে মুমিনগণ! কোনো পুরুষ যেনো অন্য কোনো পুরুষকে উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। আর কোনো নারী অপর কোনো নারীকেও যেনো উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারিনী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরকে খারাপ উপনামে ডেকোনা।

www.icsbook.info

ঈমান আনার পর মন্দ নামে ডাকা গোনাহ্‌র কাজ। যারা এসব আচার-আচরণ থেকে বিরত হবে না, তারাই হবে যালেম। (১২) হে মুমিনগণ! তোমরা বেশী বেশী ধারণা থেকে দূরে থাকো। কেননা, কোনো কোনো ধারণায় পাপ হয়ে থাকে। তোমরা কারো গোপনীয় বিষয় তালাশ করে বেড়িও না। আর তোমাদের কেউ যেনো অন্য কারও অসাক্ষাতে গীবত (পরনিন্দা) না করে। তোমাদের কেউ কি তার মরা ভাই এর গোশ্‌ত খাওয়া পছন্দ করবে ? অথচ তোমরা তা অপছন্দ করো। আল্লাহ্‌কে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ يَاَيُّهَا-ওহে বা হে। اَلَّذِيْنَ-যারা اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছো। لاَ–না। يَسْخَرْ–উপহাস/ঠাট্টা/বিদ্রুপ করা। قَوْمٍ-জাতি বা গোত্র, এখানে পুরুষ। مِنْ-থেকে। عَسٰى-হতে পারে বা কেননা। يَكُوْنُوْا তারা হবে। خَيْرً-উত্তম। مِنْهُمْ-তাদের থেকে। وَ -এবং। نِسَاءٌ -স্ত্রী লোক/নারী।-يَكُنَّ -তারা হবে (স্ত্রী লিঃ)। مِنْهُنَّ-তাদের থেকে (স্ত্রী লিঃ)। لاَتَلْمِزُوْا-তোমরা দোষারোপ করো না। اَنْفُسَكُمْ-তোমাদের নিজেদেরকে। وَلاَ تَنَابَزُوْا- তোমরা ডেকো না বা সম্বোধন করো না। بِالْاَلْقَابِ-খারাপ উপনামে বা উপাধীতে। بِئْسَ-গানাহ্‌/ খারাপ। لِاسْمُ-নাম। اَلْفُسُوْقُ-ফাসেকী/ মন্দ/ খারাপ। بَعْدَ-পরে। اَلْاِيْمَانِ-বিশ্বাস। مَنْ-যে। لَمْ يَتُبْ–তাওবা করবে না বা বিরত হবে না। فَاُوْلٰئِكَ-অতঃপর ওরাই। هُمْ-তারা। اَلظّٰلِمُوْنَ- যালেম/অত্যচারী।

اِجْتَنِبُوْا-তোমরা বিরত থাকো বা দূরে থাকো। كَثِيْرًا-বেশী বা অধিক। اَلظَّنِّ -ধারণা/অনুমান। اِنَّ-নিশ্চয়, কেননা। بعض-কোনো কোনো। اِثْمٌ-পাপ, গোনাহ্। لَاتَجَسَّسُوْا-তোমরা খোজাখুজি বা তালাশ করো না। لَا يَغْتَبْ-গীবত বা বদনাম করো না। بَعْضُكُمْ-তোমাদের কেউ। بَعْضًا-অপরের। اَيُحِبُّ-তোমরা কি পছন্দ করো ? اَحَدُكُمْ-তোমাদের কেউ। اَنْ يَّاكُلَ-তোমরা যদি খাও। لَحْمَ-গোশ্‌ত। اَخِيْهِ-তার ভাই। مَيْتًا-মৃত। فَكَرِهْتُمُوْهُ-অতঃপর তোমরাই তা অপছন্দ করো। وَاتَّقُوا اللّٰهَ-তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো। تَوَّابٌ-ক্ষমাকারী বা তাওবা কবুলকারী। رَحِيْمٌ-দয়ালু/মেহেরবান।

সম্বোধনঃ দারসে কুরআন মাহফিলে/প্রোগ্রামে উপস্থিত ইসলাম প্রিয় দ্বীনদার/ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ভায়েরা/বোনেরা! আস্‌সালামু আলায়কুম অয়ারাহমাতুল্লাহি অয়া বারাকাতুহ। আমি আপনাদের সামনে পবিত্র আল-কুরআনের সূরা হুজুরাতের ১১ ও ১২ নম্বর দু'টি আয়াত তিলাওয়াত ও সরল অনুবাদ পেশ করেছি। আল্লাহ্ পাক যেনো আমাকে আপনাদের সামনে সহীহ্ সালামতে এবং সঠিকভাবে দারস পেশ করার তৌফিক দান করেন। **অমা তাওফীকি ইল্লাহ্ বিল্লাহ্।**

সূরার নামকরণঃ এই সূরার চতুর্থ আয়াতের مِنْ وَّرَاۤءِ الْحُجُرٰتِ-এর اَلْحُجُرٰتِ (আল-হুজুরাত) শব্দটিকেই গোটা সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। 'হুজুরাত' শব্দের অর্থ চার দেয়াল বিশিষ্ট ঘর। সুতরাং এটা সেই সূরা যার মধ্যে 'আল-হুজুরাত" শব্দটি উল্লেখ রয়েছে। সূরার

এই নামকরণ শিরোনাম হিসেবে নয় বরং প্রতিকী বা চিহ্ন হিসেবে করা হয়েছে। (সূরার নামকরণ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ এক নম্বর দারসে দেখুন)।

সূরাটি নাযিল হবার সময় কালঃ সূরাটির বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত অনেকগুলো সামাজিক আইন-কানুন, রীতি-নীতি ও বিধি-বিধান বিভিন্ন সময় ও অবস্থায় অবতীর্ণ হয়। সূরার বিষয়বস্তু দেখলে এবং বিভিন্ন হাদীসের বর্ণনা থেকে এর সত্যতা প্রমাণিত হয়। হাদীসের বর্ণনা হতে এটাও জানা যায় যে, সামাজিক এই বিধি-বিধানগুলো অধিকাংশই মাদানী জীবনের শেষের দিকে নাযিল হয়। যেমন ৪ নম্বর আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো ৯ম হিজরীতে বনী তামীম গোত্রের প্রতিনিধি আগমন উপলক্ষে। ৬ নম্বর আয়াত অবতীর্ণ হয় অলীদ ইবনে উক্‌বা সম্পর্কে। তাকে নবী করীম (সাঃ) বনুল মুস্তালিক গোত্রের কাছে যাকাত আদায়ের জন্য পাঠিয়েছিলেন। আর তিনি মক্কা বিজয়কালে মুসলমান হয়েছিলেন।

সূরার বিষয়বস্তুঃ এই সূরাটির মূল বিষয় হলো মুসলমানদেরকে ঈমানের উপযোগী আদব-কায়দা, নিয়ম-নীতি ও সামাজিক শিষ্ঠাচার শিক্ষা দেওয়া। যেমন–

প্রথমতঃ সূরায় মুমিনদেরকে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় আচার-আচরণ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ মুমিনদের কোনো উড়ো খবর শুনেই সিদ্ধান্ত না নেবার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বরং সংবাদ বা খবরটি সঠিক কি না তা আগে যাচাই-বাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে বলা হয়েছে । না হলে হিতে বিপরীত হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

তৃতীয়তঃ যদি দু'জন মমিন ব্যক্তি বা দু'টি দল দ্বন্দ্বে বা বিবাদে জড়িয়ে পড়ে, তাহলে তাদের মধ্যে মিমাংসা করে মিটমাট করে দেবার জন্য বলা হয়েছে।

চুতর্থতঃ মানুষের মধ্যে সম্পর্ক বিনষ্টকারী এবং সামাজিক শৃংখলা নষ্টকারী

মৌলিক এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছয়টি খারাপ আচারণ বা কাজ যেমন- ঠাট্টা-বিদ্রুপ, দোষারোপ, মন্দ উপনামে ডাকা, বেশী বেশী ধারণা, পরের দোষ খোজা-খুজি এবং গীবত বা পরনিন্দা করা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

পঞ্চমতঃ মানুষকে গোত্রীয় এবং বংশীয় মর্যাদার জন্য অহংকার করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা সকলেই একই পিতা-মাতার ঔরষজাত সন্তান। বিভিন্ন গোত্রে ও বংশে বিভক্ত আল্লাহ্ই করেছেন কেবলমাত্র পরিচিতির জন্য।

ষষ্ঠতঃ সূরার সব শেষে আল্লাহ্পাক জনগণকে মৌখিক ঈমানের দাবী না করে, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনে তাঁর জন্যই নিজের জান-মালকে সঁপে দিতে বলা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াত দুটির বিষয়বস্তুঃ দারসের জন্য তিলাওয়াতকৃত আয়াত দু'টির মূল বিষয়বস্তু হলো, মানুষের মধ্যে সম্পর্ক বিনষ্টকারী এবং সামাজিক পরিবেশ নষ্টকারী ছয়টি খারাপ আচরণ পরিহার।

ব্যাখ্যাঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! সূরা হুজুরাত এর তিলাওয়াকৃত আয়াত দু'টির প্রয়োজনীয় বিবরণ প্রদানের পর এখন আপনাদের সামনে ব্যাখ্যা পেশ করছি। আয়াত দু'টিতে মানুষের মধ্যে সম্পর্ক শিথিলকারী ছয়টি বদ আচরণের উল্লেখ করা হয়েছে।

মুমিন মুসলমানদের ছয়টি হারাম বা নিষিদ্ধ কাজ বা আচরণের মধ্যে প্রথম আয়াতে তিনটি যেমন- (১) কোনো মুসলমানকে উপহাস বা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা। (২) কাউকে দোষারোপ করা ও (৩) কাউকে অপমানকর উপনামে ডাকা। পরবর্তী আয়াতে তিনটি যেমন- (৪) কুধারণা করা। (৫) গোয়েন্দাগিরী করা এবং (৬) গীবত বা পরনিন্দা করা।

আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ

يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ

হে মুমিনগণ! কোনো পুরুষ যেনো অপর কোনো পুরুষকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ বা উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। আবার কোনো নারীও যেনো অপর কোনো নারীকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ বা উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারিনী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে।

প্রথমত নিষিদ্ধ আচরণঃ لَا يَسْخَرْ ঠাট্টা-বিদ্রুপ বা উপহাস না করা।

এখানে ছয়টি নিষিদ্ধ আচরণের প্রথম আচরণটি উল্লেখ করা হয়েছে। ঈমাম কুরতবী (রঃ) বলেনঃ কোনো ব্যক্তিকে হেয় ও অপমান করার জন্য তার কোনো দোষ এমন ভাবে উল্লেখ করা যাতে উপস্থিত শ্রোতারা হাঁসতে থাকে, তাকে سَخْرِيَةٌ ও اِسْتِهْزَاءٌ-বলা হয়। এটা যেমন মুখে করা যায়, তেমনি হাত-পা ব্যঙ্গ করে কিংবা ঈশারা ইঙ্গিতের মাধ্যমেও করা যায়। আবার কারো কথা শুনে অপমানের ভঙ্গিতে বিদ্রুপ করার মাধ্যমেও হতে পারে। কেউ কেউ বলেনঃ উপস্থিত লোকদের হাঁসির খোরাক হতে পারে, এমনভাবে কারও সম্পর্কে আলোচনা করাকে سَخْرِيَةٌ বা উপহাস বলা হয়। কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী এসবই হারাম বা নিষিদ্ধ।

পূরুষদের জন্য قَوْمٌ (কাউম) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ হলো, অভিধানে এ শব্দটি পুরুষদের জন্যই নির্ধারিত। সাধারণতঃ আল-কুরআনে পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য 'কওম' শব্দ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এখানে পূরুষ-নারী সম্ভবতঃ দু'টি কারণে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম কারণ হলোঃ سَخْرِيَةٌ? অর্থাৎ ঠাট্টা-বিদ্রুপ বা উপহাসের আচরণটি গুরুত্বের সাথে নিষিদ্ধ করার জন্য পুরুষ-নারী পৃথক ভাবে

উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ হলোঃ ঠাট্টা-বিদ্রুপতো এমনি নিষিদ্ধ, তারপর শরীয়াত পুরুষ-নারীর এক সাথে মেলা-মেশা হারাম করেছে। আর এ কাজটি একই সাথে খোলামেলা বা উঠাবসা না করলে কোনো ভাবেই করা সম্ভব হয় না। এজন্যই পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

আয়াতাংশের সারমর্ম হলো এই যে, যদি কোনো ব্যক্তির দেহে, আকার-আকৃতিতে কিংবা গঠন প্রকৃতিতে কোনো দোষ বা ত্রুটি চোখে পড়ে তা হলে তা নিয়ে কারও ঠাট্টা-বিদ্রুপ, উপহাস অথবা হাঁসাহাঁসি বা তামাশা কিংবা মস্‌করা করা কারো জন্য উচিত নয়। তার কারণ হলো, সেই ব্যক্তির সততা, আমলের আন্তরিকতা এবং নিয়াতের বিশুদ্ধতা ইত্যাদির কারণে আল্লাহ্‌র কাছে তার চেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ হলেও হতে পারে। যা উপহাসকারীর জানা নেই।

আয়াতের প্রভাবঃ এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর সাহাবীদের মধ্যে এমন প্রভাব পড়ে যে, হযরত আমর ইবেন শোরাহ্‌ বিল (রাঃ) বলেনঃ কোনো ব্যক্তিকে বকরীর স্তনে মুখ লাগিয়ে দুধ পান করতে দেখে আমার হাঁসি আসলে আমি আশংকা করতাম, না জানি আমিও বুঝি এরূপ হয়ে যাই। "হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ কোনো কুকুরকেও ঠাট্টা করতে আমার ভয় লাগে, না জানি আমিও কুকুর হয়ে যাই।" (কুরতবী)।

শরীয়তে মানুষের অন্তরের নিয়তের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সহীহ্‌ মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) মহানবী (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেনঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ إِلٰى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلٰكِنْ يَنْظُرُ إِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ-

(কিয়ামতের দিন) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদের চেহারার সৌন্দর্য ও ধন-সম্পদের দিকে দৃষ্টি (গুরুত্ব) দেবেন না, বরং তিনি তোমাদের

অন্তরের নিয়াত ও আমলের প্রতি দৃষ্টি (গুরুত্ব) দেবেন।

হাদীসে একজন মানুষের বাহ্যিক বেশ-ভূষা, আকার-আকৃতি, চলা-ফেরা এবং ধন-সম্পদ, মান-সম্মান ইত্যাদির গুরুত্ব দেয়া হয়নি বরং গুরুত্ব দেয়া হয়েছে নেক আমল এবং নিয়াতের পরিচ্ছন্নতা ও আন্তরিকতাকে।

দ্বিতীয় নিষিদ্ধ আচরণঃ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ এবং তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ বা অভিশাপ করো না। لَمْزٌ এর অর্থ কারও দোষ ও খুত খুঁজে বের করা, দোষ প্রকাশ করা এবং দোষ ও খুতের কারণে ভর্ৎসনা করা ইত্যাদি। আয়াতে উল্লেখিত দ্বিতীয় এই নিষিদ্ধ আচরণ দ্বারা পরস্পরের সম্পর্ক নষ্ট করে এবং সমাজে মারাত্মক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। এ কারণে এসব আচরণ ইসলামে হারাম ঘোষণা করেছে।

আয়াতে **পরস্পর দোষ ত্রুটি বের করো না** বলার পরিবর্তে। لَا يَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ। **নিজেদের প্রতি দোষারোপ করো না** বলা হয়েছে। এটা অত্যন্ত উন্নতমানের বাচন ভঙ্গী। এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, অন্যের প্রতি দোষারোপ করার অর্থই হলো নিজের উপর দোষারোপ করা। কারণ হলো, কেউ কারো দোষ বা খুত বের করলে সেতো তার দোষ খুজে বের করবে। কেননা কোনো মানুষ দোষ-ত্রুটি মুক্ত নয়। যখন কেউ অন্যের দোষ খুজতে যায় তখন সে তাকেও নিজের দোষ খোজার সুযোগ করে দেয়। সুতরাং এতে পরস্পরের সম্পর্কে ফাটল ধরে এবং সামাজিক শৃংখলা নস্ট হয়।

তৃতীয় নিষিদ্ধ আচরণঃ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ এবং (একে অপরকে) মন্দ উপনামে ডেকো না।

আয়াতে নিষিদ্ধ তৃতীয় বিষয় হচ্ছে অপরকে মন্দ বা খারাপ উপনামে ডাকা। যদ্দরুন সে অপমানবোধ করে বা অসন্তুষ্ট হয়। যেমন কাউকে ফাসেক বা মুনাফিক বলা। কাউকে অন্ধ, কানা, খোড়া, বোবা, ঠসা (বইরা) বলে ডাকা, অথবা কাউকে নিজের বাবা-মায়ের বা বংশের দোষ

কিংবা কোনো ক্রটি ধরে সম্বোধন করা। কারও ঈমান এনে ইসলাম কবুল করার পরও তার পূর্বের ধর্মের নাম যেমন- হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, এবং ইহুদী বলে অভিহিত করা। কোনো ব্যক্তি, পরিবার, গোত্র বা বংশের নিন্দা বা অপমানজনক নামকরণ করা ইত্যাদি।

শানে নযূলঃ হযরত আবু যুবায়ের আনসারী (রাঃ) বলেনঃ এই আয়াতটি আমাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন হিঁজরত করে মদীনায় আসেন, তখন আমাদের অধিকাংশ লোক দুই তিনটি করে নামে পরিচিত ছিলো। তার মধ্যে কোনো কোনো নাম কোনো কোনো ব্যক্তিকে লজ্জা এবং অপমান করার জন্য লোকেরা ব্যবহার করতো। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তা জানতেন না। তাই মাঝে মধ্যে সে সব মন্দ নাম ধরে তিনিও ডাকতেন। তখন সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) বলতেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) সে এ নাম শুনলে অসন্তুষ্ট হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অত্র আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

মন্দ কাজ থেকে তওবা করার পরেও তাকে সেই মন্দ কাজের নামে ডাকা নিষেধঃ

بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الاِيْمَانِ কেউ কোনো গোনাহ্ বা **মন্দ কাজ থেকে তওবা করার পরও তাকে সেই মন্দ কাজের নাম ধরে ডাকা অন্যায়।** উদাহরণ হিসেবে বলা যায়-চোর, ডাকাত, জেনাখোর, মদখোর, সূদখোর, তাড়িখোর ইত্যাদি বলে ডাকা। যেসব লোক চুরি, ডাকাতি, জেনা-ব্যভিচার, মদ, জুয়া ইত্যাদি অপরাধমূলক কাজ থেকে তওবা করে নিয়ে সংশোধণ হয়ে যায়, তাকে অতীত কূকর্মের দ্বারা লজ্জা দেয়া, হেয় বা খাটো করা হারাম। রাসূল (সাঃ) বলেনঃ **যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে এমন গোনাহ দ্বারা লজ্জা দেয়, যা থেকে সে তওবা করেছে। তাহলে তাকে (যে লজ্জা দেয়) সেই গোনাহ্তে জড়িয়ে আ-খেরাতে লাঞ্ছিত করার দায়িত্ব আল্লাহ্ তাআলা নিজে গ্রহণ করেন।** (কুরতবী)

পরিচিতির জন্য মন্দ নামে ডাকা জায়েজঃ কোনো লোক এমন নামে বা

উপনামে পরিচিত হয়ে যায়, যা আসলে মন্দ। কিন্তু সেই নাম ছাড়া তাকে কেউ চেনে না। সেই ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে লজ্জা দেয়া বা ছোট করার উদ্দেশ্য না থাকলে এই মন্দ নাম বা উপনামে ডাকা জায়েজ। হাদীস বিশারদগণ **আসমাউর রিজালে** 'সুলাইমান আল-আ'মাশ' (নির্বোধ সুলাইমান) এবং 'ওয়াছিল আল-আহদাব' (কুজা ওয়াছিল) প্রভৃতি পরিচয়মূলক শব্দ ব্যবহার করা জায়েজ বলেছেন।

আবার একই নামের কয়েকজন থাকলে তাদেরকে আলাদা করে চেনার জন্য যে খুত আছে তাকে সেই নামে সম্বোধন করা অবৈধ নয়। যেমন অন্ধ হলে 'অন্ধ আবদুল্লাহ', খোড়া হলে 'খোড়া আব্দুল্লাহ্' বলে ডাকা। যদিও কথাটি শুনতে ভালো শোনায় না।

অনুরূপ ভাবে যেসব নামে বাহ্যত কাউকে ছোট করা বোঝায়। কিন্তু আদর বা স্নেহ ভালোবাসার জন্য হয়ে থাকে। আর যাকে এই নামে ডাকা হয় তাতে সে নিজেও মাইন্ড করে না বা অসন্তুষ্ট হয় না, এমন পদবী ব্যবহার করা নিষেধ নয়। যেমন আবু হুরাইরা (বিড়ালের বাপ বা বিড়ালওয়ালা), আবু তোরাব (মাটির বাপ বা মাটি মিশ্রিত) ইত্যাদি। রাসূল (সাঃ) নিজেই এসব পদবী দিয়েছেন এবং ডেকেছেন।

উত্তম নামে ডাকা সুন্নতঃ "রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ এক মুমিনের উপর আর এক মুমিনের হক বা অধিকার হলো, তাকে অধিক পছন্দনীয় নাম ও পদবীর সাথে ডাকা।" এ কারণেই আরবে ডাক নামের খুব প্রচলন ছিলো। রাসূল (সাঃ)ও তা পছন্দ করতেন। রাসূল (সাঃ) বিশেষ বিশেষ কিছু সাহাবীকে কিছু পদবী দিয়েছিলেন। যেমন, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)-কে 'আতীক', হযরত ওমর (রাঃ)-কে 'ফারুক', হযরত হামযা (রাঃ)-কে 'আসাদুল্লাহ্' এবং খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ)-কে 'সাইফুল্লাহ্' পদবী দান করেছিলেন।

নাম ডাকার সময় সতর্কতা ঃ নাম ডাকার সময় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। যদি কারো নাম আল্লাহ্‌র সিফাতী নাম হয়, তবে তার আগে 'আব্দুল' শব্দটি ব্যবহার করা উচিত। যেমন আব্দুর রহমান, আব্দুর রহীম,

www.icsbook.info

আব্দুস সাত্তার, আব্দুল খালেক ইত্যাদি।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ–

যারা (মন্দ নামে ডাকার) একাজ থেকে বিরত হয় না তারাই যালেম। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি ঈমান আনার পরেও তার পূর্বের আমল বা ধর্মের নামে ডাকা কিংবা খোটা দেয়া অত্যন্ত বাজে অভ্যাস। এ ধরনের অভ্যাস পরিত্যাগ করা অবশ্যই উচিত। তার পরও যদি কেউ এই আচার-আচরণে অভ্যস্ত থাকে তবে সে মানুষের আত্ম-মর্যাদা, হক বা অধিকার নষ্ট করার দায়ে যালেম হিসেবে আখ্যায়িত হবে।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ পাক নিষিদ্ধ পরবর্তী তিনটি আচরণের কথা উল্লেখ করে বলেনঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا

হে মুমিনগণ! তোমরা বেশী বেশী ধারণা হতে বিরত থাকো। কেননা কোনো কোনো ধারণায় পাপ হয়ে থাকে। তোমরা (পরের দোষ) তালাশ করে বেড়িও না। আর তোমাদের কেউ যেনো কারো গীবত বা পরনিন্দা না করে।

চতুর্থ নিষিদ্ধ আচরণঃ ظَنّ তথা ধারণা। এসম্পর্কে আয়াতে বলা হয়েছে اِجْتَنِبُوا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ **তোমরা বেশী বেশী ধারণা থেকে বেঁচে থাকো।** এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে- **নিশ্চয় কতক ধারণা পাপ।** এ থেকে জানা যায় যে, আয়াতে সব ধরনের ধারণা বা অনুমান একেবারেই নিষেধ করা হয়নি। তবে অতি ধারণা বা অনুমানের উপর ভিত্তি করে খুব বেশী কাজ করা, কথা বলা এবং প্রতিটি

www.icsbook.info

বিষয়ে ধারণা অনুমানের অনুসরণ করা হতে নিষেধ করা হয়েছে। এখন আমাদের জেনে নেওয়া দরকার যে, কোন্ কোন্ ধারণা পাপ বা নিষেধ এবং কোন্ কোন্ ধারণা জায়েয।

ধারণার প্রকারঃ 'কোনো কোনো ধারণা পাপ' এই কথাটি বিশ্লেষণ করলে ধারণা বা অনুমান কয়েক প্রকারের।

ইমাম আবু বকর জাস্‌সাস তাঁর রচিত "আহকামুল কুরআনে" ধারণার চারটি প্রকার উল্লেখ করেছেন। (১) **এক প্রকার ধারণা হারাম** বা নিষেধ। (২) **দ্বিতীয় প্রকার** ধারণা করা ওয়াজিব বা জরুরী। (৩) তৃতীয় প্রকার ধারণা করা মুস্তাহাব বা মোটামুটি। (৪)চতুর্থ প্রকার ধারণা জায়েয বা বৈধ।

উল্লেখিত চার প্রকার ধারণার বিশ্লেষণ নিচে আলোচনা করা হলোঃ

১. হারাম বা নিষিদ্ধ ধারণাঃ আল্লাহ্‌র প্রতি কু-ধারণা রাখা নিষেধ। যেমন 'তিনি আমাকে শাস্তিই দেবেন অথবা বিপদেই রাখবেন এটা আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও রহমত থেকে নিরাশা। এ ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) বলেনঃ **আল্লাহ্‌র প্রতি ভালো ধারণা রাখা ছাড়া তোমাদের মৃত্যু বরণ করা উচিত নয়া।** (রাবী যরত জাবের রাঃ)। অন্য এক হাদীসে রাসূল (সাঃ) বলেনঃ (আল্লাহ্ পাক বলেন), **আমি আমার বান্দার সাথে তেমনি ব্যবহার করি যেমন সে আমার ব্যাপারে ধারণা রাখে।** এ থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্‌র প্রতি ভালো ধারণা রাখা ফরয এবং খারাপ ধারণা রাখা হারাম। অনুরূপ ভাবে রাসূলের প্রতিও ভালো ধারণা রাখা ফরয এবং খারাপ ধারণা রাখা হারাম। এমনিভাবে যে সব ঈমানদার মুসলমান বাহ্যিক অবস্থার দিক দিয়ে ভালো, চরিত্রবান। যাদের সাথে সবসময় উঠা-বসা এবং মিল মিশ থাকে, তাদের প্রতি ভালো ধারণা রাখা। তাদের সম্পর্কে কোনো প্রমাণ ছাড়া খারাপ ধারণা করা হারাম বা নিষেধ। এ সম্পর্কে রাসূল(সাঃ) বলেনঃ

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ

তোমরা ধারণা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা ধারণা বড় মিথ্যা কথা। (রাবী আবু হোবায়রা রাঃ)। এখানে সবার মতেই ধারণা বলতে প্রমাণ ছাড়া মুসলমানদের প্রতি কূ-ধারণা বোঝানো হয়েছে। কারও প্রতি অকারণে খারাপ ধারণা পোষণ করা ও কারো সাথে সম্পর্ক নির্ধারণে সব সময় খারাপ ধারণা দিয়েই শুরু করা হতে নিষেধ করা হয়েছে। কিংবা যারা সৎ ও ভদ্রলোক এদের ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করাই পাপ।

২. ওয়াজীব বা জরুরী ধারণাঃ এই প্রকারের ধারণা-অনুমান প্রয়োগ ছাড়া বাস্তব জীবনে কোনই উপায় থাকে না। যেমন-পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ মিমাংসা এবং আদালতে বিচারকের স্বাক্ষীদের স্বাক্ষ্যের উপর প্রবল ধারণার ভিত্তিতে রায় ঘোষণা করা জরুরী। যেখানে আল-কুরআনে কোনো বিধান বা সমাধান উল্লেখ নেই। এসব ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির স্বাক্ষ্য অনুযায়ী কাজ করা বিচারকের জন্য জরুরী। এ লক্ষ্যে স্বাক্ষীর স্বাক্ষের উপর প্রবল ধারণা রাখা ওয়াজিব। এমনিভাবে যেখানে কেবলা কোন্ দিকে জানা থাকে না এবং জেনে নেবার কোনো ব্যবস্থা থাকে না, সেখানে নিজের প্রবল ধারণা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করা ওয়াজিব। আবার কোনো ব্যক্তির উপর কোনো ক্ষতিপূরণ দেয়া ওয়াজিব হলে সেই জিনিসের দাম ধারণার ভিত্তিতে ধার্য্য করে তা বাস্তবায়ন করা জরুরী।

৩. জায়েয ধারণাঃ এই প্রকারের ধারণা অনুমান এমন যা খারাপ মনে হলেও তা জায়েয। যেমন এক ব্যক্তি বা দলের লোকদের চরিত্র, কাজ-কাম, ভূমিকা কিংবা তার লেন-দেন, সম্পর্ক-সম্বন্ধ রক্ষা ও ধরণ-ধারণে এমন সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যার ফলে তার প্রতি ভালো ধারণা করার কোনো বাস্তবতা নেই বরং তার প্রতি খারাপ ধারণা করাই উপযুক্ত কারণ বর্তমান থাকে। এরূপ অবস্থায় তার প্রতি সাদা দিলে ভালো ধারণা রাখতে হবে শরীয়ত এমন কথা বলেনি। তবে এর সীমা আছে। তার ক্ষতি এবং অকল্যাণ হতে বাঁচার জন্যই কেবলমাত্র সতর্কতামূলক খারাপ ধারণা করা জায়েয। যেমন নিজের জিনিস অন্য কাউকে না দেয়া। এর মানে এই নয় যে তাকে চোর মনে করা হচ্ছে।

www.icsbook.info

জায়েয ধারণার আরও উদাহরণ হলো- যেমন নামাজ পড়ার সময় নামাজের রাকায়াতের ব্যাপারে দুই না তিন রাকাত পড়লাম সন্দেহ হলে এ অবস্থায় প্রবল ধারণার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া জায়েয।

৪. মোস্তাহাব বা উত্তম ধারণাঃ প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি সু ধারণা রাখা উত্তম। এর জন্য সওয়াব পাওয়া যায়। যদি কোনো মানুষের মধ্যে ভাল-মন্দ দু'টোই থাকার সম্ভাবনা থাকে, তবে ভালো দিকটি ধরে নেয়াটাই উত্তম এবং খারাপ দিকটির ব্যাপারে সতর্ক এবং সচেতন থাকা উত্তম।

এসব আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ধারণা-অনুমান কোনো নিষিদ্ধ জিনিস নয়। বরং কোনো কোনো অবস্থায় এটা অত্যন্ত পছন্দনীয় এবং কোনো কোনো সময় এটা জরুরী। আবার কোনো কোনো অবস্থায় তা মোটামুটি যা একটা সীমা পর্যন্ত জায়েয। তারপর আর জায়েয নয় এবং কোনো কোনো সময় তা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এ কারণে কুরআনের এই আয়াতে ধারণাকে একেবারেই নিষিদ্ধ করা হয়নি। বরং বলা হয়েছে বেশী বেশী ধারণা-অনুমান করা পাপ। এতে বোঝা যায় যে, সব ধারণায় পাপ নয়।

পঞ্চম নিষিদ্ধ আচরণঃوَلَا تَجَسَّسُوْا**-তোমরা কারও দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়িও না।** আয়াতে দ্বিতীয় এবং দারসের পঞ্চম নিষিদ্ধ আচরণ হলো - تَجَسَّسُوْا অর্থাৎ কারো দোষ-ত্রুটি তালাশ বা খোজা-খুজি করা। এ শব্দে দু'টি উচ্চারণ আছে। একটি لَا تَجَسَّسُوْا 'জীম' সহকারে এবং দ্বিতীয়টি تَحَسَّسُوْا 'হা' সহকারে। বোখারী এবং মুস-লিম শরীফের হাদীসে এ দু'টি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। وَلَا تَجَسَّسُوْا এবং لَا تَحَسَّسُوْا উভয় শব্দের অর্থ কাছাকাছি। সুতরাং একে অপরের দোষ-ত্রুটি তালাশ করে বেড়ানো, কারো অবস্থা এবং কাজ-কামের ব্যাপারে দোষ ধরার উদ্দেশ্যে ওঁত পেতে থাকা। এ ধরনের কাজ মনের

www.icsbook.info

মধ্যে খারাপ ধারণা নিয়ে হোক কিংবা কারো ক্ষতি করার উদ্দেশ্যেই হোক, অথবা কৌতুহল সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই হোক সকল অবস্থায়ই হারাম বা নিষিদ্ধ।

একজন মুমিন মুসলমানের কাজ এটাতো হতে পারে না যে, সে কারো গোপন বা অপ্রকাশ্য কাজ আতি-পাতি করে খুজে বেড়ানো। পর্দার আড়ালে কি আছে তা চোখ পেতে দেখার চেষ্টা করা। কার কতটা দোষ-ত্রুটি বা দুর্বলতা আছে তা জানার আপ্রাণ চেষ্টা করা।

ব্যক্তিগত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করাও এর অন্তর্ভূক্তঃ অন্যের চিঠি-পত্র না বলে পড়া, দু'জনের ব্যক্তিগত কথাবার্তা কান পেতে কিংবা আঁড়ি পেতে শোনা, প্রতিবেশীর ঘরে ওঁত পাতা বা চোখ পাতা কিংবা কান পেতে শোনা বিভিন্নভাবে একে অপরের বা স্বামী-স্ত্রীর একান্ত কথা-বার্তা শোনা বা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার-স্যাপার আতি-পাতি করে তালাশ করে বেড়ানো, ঘুমের ভান করে কারও কথা শোনাও অত্যন্ত নিম্ন চরিত্রের লোকদের কাজ। এতে সমাজে নানা ধরনের বিপর্যয় ও অশান্তি সৃষ্টি হয়।

গোপন তথ্য খুঁজে বেড়ানো লোকদের সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) একবার তাঁর বক্তৃতায় বলেনঃ

"হে মুখে মুখে ঈমানের দাবীদারেরা, যাদের অন্তরে একখনও ঈমান প্রবেশ করেনি, তোমরা শুনে রাখো, মুসলমানদের দোষ-ত্রুটি খোজা-খুজি করে বেড়িওনা। কেননা, যে ব্যক্তি মুসলমানদের দোষ-ত্রুটি তালাশ করে বেড়ায়, আল্লাহ্ নিজেই তার দোষ-ত্রুটি প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। আর আল্লাহ্ যার পেছনে লেগে যান, তাকে তার নিজের ঘরেই লাঞ্ছিত করে ছাড়েন।" (আবু দাউদ)

রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দাগিরী নিষেধঃ অপরের দোষ-ত্রুটি খোজা-খুজি করে বেড়ানোর কাজ থেকে দূরে থাকা শুধু ব্যক্তির ক্ষেত্রেই করণীয় নয়। বরং ইসলামী রাষ্ট্রের জন্যও এটা করণীয়। ইসলামী শরীয়াত অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করা ও বিরত রাখার দায়িত্ব সরকারের উপর অর্পণ করেছে। কিন্তু এটা অনুমতি দেয়নি যে, সরকারের একটা গোয়েন্দা বিভাগ

www.icsbook.info

গড়ে তুলে নাগরিকদের গোপন দোষ-ক্রটি খুজে খুজে বের করবে এবং তাদের ধরে ধরে এনে শাস্তি দেবে। বরং সরকারের কাজ হবে নাগরিকদের মধ্যে তাকওয়ার গুণ সৃষ্টি করে তাদেরকে গোপন দোষ-ক্রটি থেকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করা। এজন্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, উপদেশ, ওয়াজ-নসীহত এবং সাধারণ জনগণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। ভালো কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং মন্দ ও পাপ কাজের পথ বন্দ করে দেওয়ার মাধ্যমে একটি পবিত্র তাকওয়াপূর্ণ সামাজিক পরিবেশ গড়ে তোলার চেষ্টা করা। উদাহরণ হিসেবে দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) এর ঘটনা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই ঘটনায় সরকার এবং নাগরিকদের বিশেষ শিক্ষা রয়েছে। ঘটনাটি হলো "একবার রাতের বেলায় ঘুরতে ঘুরতে হযরত ওমর (রাঃ) এক ব্যক্তির গলার আওয়াজ শোনতে পেলেন। লোকটি নিজের ঘরে বসে গান গাইতেছিলো। গান শুনে তাঁর মনে সন্দেহ জাগলো। তিনি লোকটির প্রাচীরের উপর উঠে বসে নিজ চোখে দেখতে পেলেন ঘরের মধ্যে মদ ও নারী উভয়ই লোকটির পাশে রয়েছে। খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) ডাক দিয়ে বললেনঃ ও হে আল্লাহ্র দুশমন! তুই কি মনে করে বসেছিস যে, তুই আল্লাহ্র নাফরমানী করবি, আর আল্লাহ্ তোর গোপন নাফরমানীর কথা প্রকাশ করে দেবেন না ? একথা শোনে লোকটি জবাব দিলো, আমীরুল মু'মিনীন! খুব তাড়াহুড়ো করবেন না। একটু বুঝতে চেষ্টা করুন, আমি একটা পাপ করে থাকলে আপনি তো এক সাথে তিনটি পাপ করে বসলেন। (এক) আল্লাহ্ অন্যের দোষ-ক্রটি খুজে বেড়াতে নিষেধ করেছেন, অথচ আপনি তাই করলেন। (দুই) আল্লাহ্র নির্দেশ হলো- অন্যের ঘরে প্রবেশের সময় মূল দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে, অথচ আপনি প্রাচীরের উপর চড়ে বসেছেন। (তিন) আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন, নিজেদের ঘর ছাড়া অন্যের ঘরে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করবে না, অথচ আপনি আমার কাছে অনুমতি না নিয়েই আমার ঘরে চলে এসেছেন ? লোকটির মুখে এ কথাগুলো শোনে হযরত ওমর (রাঃ) নিজের ভুল বোঝতে পেরে ক্রটি স্বীকার করে নিলেন। ফলে তিনি এই লোকটির বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন না।

অবশ্য তিনি লোকটির কাছ থেকে ভবিষ্যতে ভালো পথে চলার অঙ্গীকার নিলেন। (মাকারীমে আখলাক, আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে জাফর আল-খারায়েতী থেকে বর্ণিত।)

এই ঘটনা থেকে জানা গেলো যে, কেবল ব্যক্তিদের জন্যই নয়, ইসলামী সরকারের জন্যেও জায়েয নয় আতি-পাতি করে খুজে খুজে লোকদের ব্যক্তিগত পাপের সন্ধান করা ও তাদেরকে পাকড়াও করে শাস্তি দেয়া।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ

প্রশাসন কর্তৃপক্ষ যদি জনগণের প্রতি সন্দেহের বশবর্তী হয়ে তাদের দোষ খোজতে শুরু করে, তখন তারা তাদেরকে বিপর্যস্তই করে ছাড়ে। (আবু দাউদ)।

ক্ষেত্র বিশেষে অনুসন্ধান করা জায়েযঃ উপরের অনুসন্ধান করা সংক্রান্ত ব্যাপারে যেসব বিষয় নিষেধ করা হয়েছে এটা ইসলামের সাধারণ নিয়ম। কিন্তু এই সাধারণ নিয়মের কিছু ব্যতিক্রমও আছে। যেখানে খোজ খবর নেবার প্রয়োজন আছে। যেমন যদি কোনো ব্যক্তি বা দলের আচার-আচরণে সমাজে বিপর্যয়ের স্পষ্ট আলামত লক্ষ্য করা যায় এবং তার বা তাদের কোনো অপরাধের মধ্যে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা হয়, তখন সরকার তার বিশেষ গোয়েন্দা বাহিনী দ্বারা তার বা তাদের প্রকৃত অবস্থা বা গতিবিধি জানার জন্য অনুসন্ধান চালাতে পারে। অথবা কোনো পরিবারে বিয়ের প্রস্তাব দিলে কিংবা কারও সাথে যৌথ ব্যবসা-বাণিজ্য করতে ইচ্ছা করলে, তখন সে নিজের প্রতি আস্থা আনার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের সঠিক বিষয় জানার জন্য যাচাই-বাচাই করতে পারে। শরীয়তে এটা নিষেধ করা হয়নি।

ষষ্ঠ নিষিদ্ধ আচরণঃ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا **আর তোমরা একে অপরের গীবত (পরনিন্দা) করো না।** আয়াতের তৃতীয় এবং দারসের সর্বশেষ নিষিদ্ধ বিষয় হলো-গীবত বা পরনিন্দা করা।

www.icsbook.info

গীবত কি ? গীবত হলো কোনো ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে এমন কথা বলা, যা জানতে পারলে সে অসন্তুষ্ট হবে। গীবত সম্পর্কে স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) বলেনঃ

ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيْلَ اَفَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ فِىْ اَخِىْ مَا اَقُوْلُ ؟ قَالَ اِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ اَغْتَبْتَهُ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهُ-

গীবত হলো- তুমি তোমার ভাই এর সম্পর্কে এমনভাবে উল্লেখ করবে যে, তা তার অপছন্দ হবে। জিজ্ঞেস করা হলো আমার ভাই এর মধ্যে যদি সেই দোষ পাওয়া যায় যা আমি বলছি। তা হলে (সেটাও কি গীবত হবে) আপনার মত কি ? রাসূল (সাঃ) বললেনঃ তার মধ্যে সেই দোষ যদি পাওয়া যায়, তবেই তো তুমি তার গীবত করলে। আর যদি তার মধ্যে সেই দোষ নাই থেকে থাকে, তা হলে তুমি তো তার উপর মিথ্যা দোষারোপ করলে। (যা আরো কঠিন অপরাধ এবং পাপ কাজ)। (রাবী আবু হুরাইরা (রাঃ)- মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজী)

অত্র হাদীস থেকে জানা গেলো, কারও বিরুদ্ধে তার অসাক্ষাতে মিথ্যা অভিযোগ তোলাকে **বুহতান** বলা হয়। আর তার সত্যিকার দোষের কথা বলাই **গীবত**। এরূপ বলা স্পষ্ট ভাষাতে হোক, কিংবা ইশারা ইংগিতে হোক, উভয় অবস্থায় এটা নিষেধ। অনুরূপ ভাবে এটা ব্যক্তির বেঁচে থাকা অবস্থায় হোক, কিংবা মৃত্যুর পর করা হোক, উভয় অবস্থায় এটা গীবত। এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

এখানে 'অনুপস্থিতিতে' কথা থেকে এরূপ বোঝা ঠিক হবে না যে, ব্যক্তির উপস্থিতিতে মনে কষ্ট দেয়া কথা বলা জায়েয হবে। কেননা এটা গীবত নয়। لَمْز। তথা দোষ বের করার অন্তর্ভুক্ত। সূরা হুমাযায় আল্লাহ্

পাক বলেন- وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ **প্রত্যেক পেছনে এবং সামনা সামনি পরনিন্দাকারীর জন্য ধ্বংস।** এতে বোঝা যায় যে ব্যক্তির সামনেও কষ্টদায়ক কথা বলা যাবে না।

ক্ষেত্র বিশেষে গীবত করার অনুমতি রয়েছেঃ কারও অনুপস্থিতিতে বা কারও মৃত্যুর পর তার দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা যদি বাস্তবিকই প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং প্রয়োজনটা শরীয়ত সম্মত হয়, আর সেই প্রয়োজন গীবত ছাড়া পূরণ করা সম্ভব না-ই- হয়। এমনকি গীবত না করলে এর চেয়ে আরও বড় ধরনের ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে সেই গীবত হারাম বলে গণ্য হবে না। নবী করীম (সাঃ) অনুমোদিত গীবত সম্পর্কে একটি নীতি কথা উল্লেখ করে বলেছেনঃ **কোনো মুসলমানের মান-সম্মানের উপর অকারণ ও অন্যায় আক্রমণ খুব নিকৃষ্ট ধরনের বাড়াবাড়ি।** (আবু দাউদ)।

এই কথাটিতে 'অকারণ ও অন্যায়' বলে যে শর্ত আরোপ করা হয়েছে তা হতে স্পষ্টভাবে বোঝতে পারা যায় যে, 'কারণে ও ন্যায় সংগত' হলে গীবত করা যাবে। যেমনঃ

১. যদি কেউ কোনা মজলিশে শরীয়ত বিরোধী কোনো ভুল বা ভিত্তিহীন কথা বলে এবং তার উপস্থিতিতে সংশোধন করার সুযোগ না দিয়েই চলে যায়। তা হলে উপস্থিত সাধারণ মানুষকে ভুল তথ্য থেকে মুক্ত করার জন্য উক্ত ব্যক্তির অনুপস্থিতে ত্রুটি বলা যেতে পারে। তাছাড়া সঠিক ফতোয়া পাবার উদ্দেশ্যে কোনো মুফতীর নিকট সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করা যেতে পারে।

২. বিয়ে-সাদীর ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ে উভয়ের মধ্যে যদি কোনো দোষ-ত্রুটি থাকে তবে তাদের অস্বাক্ষাতে সম্পর্ক সৃষ্টিকারীদেরকে অবহিত করা যেতে পারে। **যেমন একবার ফাতিমা বিনতে কাইস নামে এক মেয়েকে বিবাহ করার জন্য একই সংগে ও একই সময় হযরত মুয়াবিয়া এবং আবুল জাহাম (রাঃ) প্রস্তাব দেন। প্রস্তাব পাবার পর মেয়ে পক্ষের**

www.icsbook.info

লোকেরা নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে পরামর্শ চাইলে তিনি বলেনঃ মুয়াবিয়া গরীব মানুষ। আর আবুল জাহাম স্ত্রীদেরকে খুব মারপিট করে থাকে। (বুখারী মুসলিম)। রাসূল (সাঃ) বৃহত্তর স্বার্থে মেয়েটির ভবিষ্যৎ জীবনের দিকে লক্ষ্য রেখেই তাদের উভয়ের দোষ বলে দেয়া জরুরী মনে করেছিলেন।

৩. স্ত্রী তার যালেম স্বামীর অনুপস্থিতিতে অভিযোগ পেশ করলে গীবত হবে না। **যেমন, এক সময় হযরত আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা নবী করীম (সাঃ) এর কাছে এসে অভিযোগ করলেন, আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ লোক। আমাকে এবং আমার ছেলে-মেয়েদেরকে প্রয়োজনীয় জীবিকা সংগ্রহ করে দেয় না।** (বুখারী মুসলিম)। রাসূল (সাঃ) এটা স্বামীর বিরুদ্ধে গীবত হবার পরেও তাকে এতে বারণ করেননি। কেননা মাযলুম যালেমের বিরুদ্ধে এমন ব্যক্তির কাছে অভিযোগ পেশ করতে পারে যিনি তা দূর করার ক্ষমতা রাখেন।

৪. সংশোধনীর উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তি, শ্রেণী বা গোষ্ঠীর দোষ-ত্রুটি এমন সব লোকের সামনে পেশ করা, যে বা যারা তা দূর করতে পারে বলে মনে করা যাবে।

৫. কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের দুষ্কৃতির ব্যাপারে জনগণকে সতর্ক করে দেয়া, কেউ কারো প্রতিবেশী হিসেবে বসবাস করতে চাইলে বা বাড়ি বাঁধতে চাইলে তার প্রকৃত অবস্থা জানিয়ে দেয়া। অথবা কেউ কারো সাথে যৌথ ব্যবসা-বাণিজ্য করতে চাইলে, কিংবা কেউ কারো কাছে কোনো মূল্যবান আমানত রাখতে চাইলে, বা কেউ ঋণ চাইলে এবং সে কারও পরামর্শ চাইলে, তখন তার ভালো-মন্দ ও দোষ-গুণ যা সে জানে স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া তার করণীয় কর্তব্য। এ জন্য যে, সে না জানার কারণে প্রতারিত না হয়।

৬. অশ্লীল-সন্ত্রাসী এবং শরীয়াতের সীমাংলঘণকারী এবং বিজাতির দোষ-ত্রুটি অস্বাক্ষাতে বলা শুধু জায়েযই নয় বরং জরুরী। যেমন-একবার নবী করীম (সাঃ) আয়েশা (রাঃ) এর ঘরে থাকা অবস্থায় এক ব্যক্তি এসে

www.icsbook.info

স্বাক্ষাতের আবেদন করলো। তখন নবী করীম (সাঃ) আয়েশাকে বললেন, এই লোকটি তার গোত্রের মধ্যে খুব খারাপ লোক। পরে তিনি ঘর থেকে বের হয়ে এসে লোকটার সাথে খুব নম্র ভাবে কথা-বার্তা বললেন। ঘরে ফিরে আসার পর হযরত আয়েশা (রাঃ) রাসূল (সাঃ)কে জিজ্ঞেস করলেনঃ আপনি তো বাইরে যাবার সময় লোকটি সম্পর্কে একথা বললেন, অথচ আপনি তার সাথে খুব ভালোভাবে কথা-বার্তা বললেন? তখন রাসূল (সাঃ) বললেন ঃ-

إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اِتِّقَاءَ فُحْشِهِ-

নিশ্চয়ই মানুষের মধ্যে সেই ব্যক্তি নিকৃষ্ট যার অশ্লীল কথা-বার্তার ভয়ে মানুষ তার সাথে দেখা স্বাক্ষাৎ করা ছেড়ে দেয়। (বুখারী মুসলিম)।

রাসূল (সাঃ) যদি আয়েশাকে একথাটি না বলতেন তাহলে তার সাথে ভালো ব্যবহার দেখে ভবিষ্যতে হয়তো তারা প্রতারিত হতে পারে।

৭. কোনো লোক যদি খারাপ উপনামে বিখ্যাত হয়ে থাকে এমন ভাবে যে, এই নামে ডাকা না হলে তাকে চিনতে পারা যায় না, তবে তাকে সেই উপনামে ডাকা যেতে পারে। তবে হেয় করার উদ্দেশ্যে করা যাবে না। শুধু পরিচিতি দানই হবে তার আসল উদ্দেশ্য। (বায়ানুল কুরআন, রুহুল মায়ানী)।

এসব সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র ছাড়া কারও অনুপস্থিতিতে দোষ-ত্রুটি বলা সম্পূর্ণ নিষেধ বা হারাম। কারো দোষ-ত্রুটি সত্য হলে তা অস্বাক্ষাতে বলা হবে **গীবত** মিথ্যা অভিযোগ ও ভিত্তিহীন হলে তা হবে **বুহতান**। আর দু'ই ব্যক্তিকে পরস্পরের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে হলে তা হবে **চোগলখোরী**।

গীবত শোনাও নিষেধঃ ইসলামী শরীয়াতে গীবত বা পরনিন্দা করা যেমন হারাম, তেমনি গীবত শোনাও হারাম। কেননা উভয়ে একই অপরাধে অপরাধি। হযরত মায়মুনা (রাঃ) বলেনঃ **আমি একদিন স্বপ্নে দেখলাম,**

জনৈক সঙ্গী ব্যক্তির মরা দেহ পড়ে আছে এবং এক ব্যক্তি আমাকে বলছে একে খাও। আমি বললাম একে কেনো খাব ? সে বললোঃ কারণ তুমি অমুক সঙ্গী গোলামের গীবত করেছ। আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কসম, আমি তো তার সম্পর্কে কখনোও কোনো ভালমন্দ কথা বলিনি। সে বললোঃ হ্যাঁ, একথা ঠিক। কিন্তু তুমি তো তার গীবত শুনেছো এবং এতে সম্মত হয়েছে। (বাধা দাওনি)। এ ঘটনার পর হযরত মায়মুনা (রাঃ) কখনও কারো গীবত করেননি এবং তার সামনে কারও গীবত করতে দেননি।

সুতরাং প্রতিটি মুমিন মুসলমানের কর্তব্য হবে, যখনই তার সামনে কারো গীবত করা হবে, তখন চুপ করে না শোনে বাধা দেয়া। শরীয়াত সম্মত কারণ ছাড়া কারো দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা হতে থাকলে তাকে আল্লাহ্‌র ভয় দেখাতে হবে এবং একাজ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিতে হবে। যদি এতেও সে বিরত না হয়, তা হলে তার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে হবে।

গীবতের পরিণামঃ অতঃপর আল্লাহ্ পাক গীবতের পরিণাম সম্পর্কে বলেনঃ

أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ

তোমাদের মধ্যে এমন কি কেউ আছে, যে তার মরা ভাই এর গোশ্‌ত খাওয়া পছন্দ করবে ? অথচ তোমরা তা ঘৃণা করো। আয়াতের এই অংশে আল্লাহ্ তাআলা গীবত করাকে মরা ভাই এর গোশ্‌ত খাবার সাথে তুলনা করে এ কাজটির জঘন্যতা ও বীভৎসতা প্রকট করে তুলে ধরেছেন। মরা মানুষের গোশ্‌ত খেলে যেমন তার (মৃত্যু ব্যক্তির) কোনো কষ্ট হয় না, তেমনি অনুপস্থিত ব্যক্তি যে পর্যন্ত তার গীবতের কথা না জানে, তারও কোনো কষ্ট হয় না। তাছাড়া মরা দেহকে খেলে যেমন সে প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় না, তেমনি গীবত করলেও প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয় না। প্রতিরোধ না থাকার ফলে দীর্ঘসময় ধরে গীবত হতে থাকে এবং এ কারণে এতে মানুষ জড়িয়ে পড়েও বেশী। এসব কারণে গীবতের

নিষিদ্ধতার উপর বেশী জোর দেয়া হয়েছে।

গীবতকারীর পরিণতিঃ "হযরত হাসান ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাঃ) বলেনঃ আমাকে (মে'রাজে) নিয়ে যাওয়া হলে আমি এমন এক দলের পাশ দিয়ে গেলাম যাদের 'নখ' ছিলো তামার। তারা তা দিয়ে নিজের মুখমন্ডল এবং দেহের গোশ্‌ত আঁচড়াচ্ছিলো। আমি জিব্‌রাঈল (আঃ)কে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা ? তিনি বললেনঃ এরা তাদের ভাই এর গীবত করতো এবং তাদের ইজ্জতহানি করতো"। (তাফসীরে মায্‌হারী)

গীবতের গেনাহঃ হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) ও জাবের (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ اَلْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا

গীবত জেনা-ব্যাভিচারের চাইতেও মারাত্মক গোনাহ্। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, এটা কিরূপে ? তিনি উত্তরে বললেনঃ এক ব্যক্তি জেনা-ব্যাভিচার করার পর তাওবা করলে তার গুনাহ্ মাফ করা হয়। কিন্তু যে গীবত করে, তার গোনাহ্ যার গীবত করা হয়েছে সে মাফ না করা পর্যন্ত মাফ হয় না। (মাযহারী)

গীবতের গোনাহ্ থেকে মাফ পাবার উপায়ঃ

উপরের এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, গীবতের মাধ্যমে আল্লাহ্ এবং বান্দাহ্‌র উভয়ের হক (অধিকার) নষ্ট করা হয়। তাই যার গীবত করা হয় তার কাছ থেকে মাফ চেয়ে নেয়া উচিত। কোনো কোনো ওলামায়ে কেরামের মতে, যার গীবত করা হয়, গীবতের সংবাদ তার কাছে না পৌছা পর্যন্ত বান্দাহ্‌র হক নষ্ট হয় না। তার জন্য তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়া জরুরী নয়। (রুহুল মায়ানী)।

কিন্তু বয়ানুল কুরআনে বলা হয়েছে, গীবতের সংবাদ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কানে না পৌছার কারণে যদিও তার কাছে ক্ষমা চাওয়া জরুরী নয়, কিন্তু যার সামনে গীবত করা হয়, তার সামনে নিজেকে মিথ্যাবাদী বলা এবং নিজের অপরাধ স্বীকার করা জরুরী। যদি সেই ব্যক্তি মারা যায়, কিংবা

www.icsbook.info

লাপাত্তা হয়ে যায় তবে তার কাফ্ফারা হলো, যার গীবত করা হয়েছে তার জন্য আল্লাহ্র কাছে মাগফিরাতের দোআ এভাবে করা যে, **হে আল্লাহ্ আমার ও তার গুনাহ্ খাতা মাফ করে দাও।** হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে-রাসূল (সাঃ) এরূপই বলেছেন।

সর্বশেষে আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ **তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাওবা কবুলকারী মেহেরবান।**

আয়াতের সর্বশেষ অংশে আল্লাহ্ পাক মুমিনদেরকে উপরোক্ত গোনাহ্র কাজ থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ্কেই ভয় করার আহবান জানিয়েছেন। কেননা, যার মধ্যে আল্লাহ্র ভয় থাকবে সে তখন এসব সামাজিক সম্পর্ক বিনষ্টকারী হারাম কাজ হতে দূরে থাকবে। সাথে এও বলা হয়েছে যে, তোমরা যেসব গোনাহ্র কাজ করে ফেলেছো তার জন্য আল্লাহ্র কাছে তাওবা করো। তিনি তোমাদের তাওবা কবুল করবেন। কেননা, আল্লাহ্ পাক তাওবাকারীকে খুব বেশী পছন্দ করেন।

শিক্ষাঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা, সূরা হুজুরাতের আয়াত দু'টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমাদের জন্য বাস্তব জীবনে যেসব শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে তা হলোঃ

❒ কোন পুরুষ অন্য নারীকে তো দূরের কথা বরং এক পুরুষ অন্য পুরুষকে এবং এক নারী অন্য নারীকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ, উপহাস এবং টিট্কারী হতে দূরে থাকবে। কেননা এতে নিজের মধ্যে বড়ত্বের ভাব সৃষ্টি হয় এবং অন্যকে হেয় বা খাটো করা হয়। আর এতে সে মনে কষ্ট পায়।

❒ কেউ কাউকে দোষারোপ বা অভিসম্পাত দেবে না।

❒ লজ্জা বা অপমানবোধ করে এমন উপনামে ডাকা যাবে না। সমাজে দেখা যায় কারো কারো নামের আগে বা পরে এমন বিকৃত উপনাম বা পদবী সংযোগ করে ডাকা হয়, যা শোনতেও খারাপ লাগে। কোনো মু-মিনের পক্ষে এভাবে ডাকা শোভনীয় নয়।

❒ কোনো নব মুসলিমকে তার পূর্বের ধর্মের বা জাতের নামে খোটা দেয়া ঠিক হবে না। ঈমান আনার পর তাকে এভাবে ডাকা বা খোটা দেয়া

www.icsbook.info

ফাসেকী কাজ।

❒ মানুষের প্রতি কূ-ধারণা পোষণ না করে, বরং সূ-ধারণা রাখা উচিত এবং উত্তম।

❒ দুশ্চরিত্রের লোকের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য সূ-ধারণা পোষণ না করে বরং সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। কেননা, অনেক সময় মানুষ সতর্কতার অভাবে বিপদের মধ্যে পড়ে যায়।

❒ অন্যের দোষ-ত্রুটি খোঁজাখুজি করে বেড়া থেকে দুরে থাকতে হবে। কারো যদি কোন দোষ-ত্রুটি নিজের চোখে ধরা পড়ে তবে তাকে সংশোধনের জন্য ইহতেসাব করতে হবে। যদি সংশোধিত না হয় তবে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত না হলে তার দোষ গোপন রাখা উত্তম। কেননা কেয়ামতের দিন দোষ গোপনকারীর দোষ আল্লাহ্ও গোপন করে রাখবেন।

❒ কারো অস্বাক্ষাতে গীবত করা যাবেনা এবং গীবত শোনাও যাবে না। কেউ গীবত করেল বাধা দিতে হবে। নয়তো সরে যেতে হবে।

❒ গীবত থেকে বাঁচার জন্য সংশ্লিষ্ট ভাই এর সংশোধনের উদ্দেশ্যে গঠনমূলক ইহ্তেসাব করতে হবে।

❒ যদি কারো গীবত হয়েই যায় তবে নিজের গোনাহ্র জন্য এবং তার মাগফিরাতের জন্য কাফ্ফারা হিসেবে দোআ করতে হবে।

❒ সমাজে বিশৃঙ্খলা এবং মানুষের হক নষ্টের গোনাহ্ থেকে বাঁচার জন্য সদাসর্বদা আল্লাহ্র ভয় দেলের মধ্যে রাখতে হবে।

❒ মানুষ যেহেতু ত্রুটির উর্দ্ধে নয়। এজন্য নিজের গোনাহ্র কথা খেয়াল করে আল্লাহ্র কাছে তাওবা করতে হবে। প্রতিদিন রাসূলের সুন্নত অনুযায়ী কমসে কম ৭০ থেকে ১০০ বার এস্তেগফার করতে হবে।

আহবানঃ প্রিয় দ্বীনি ভায়েরা/বোনেরা! দীর্ঘ সময় ধরে সূরা হুজরাতের দু'টি আয়াতের যে সব বিবরণ এবং ব্যাখ্যা পেশ করলাম। এতে যদি আমার অজান্তে কোনো ভুল-ত্রুটি হয়ে যায়, তার জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর দারস থেকে যেসব শিক্ষা লাভ করলাম তা যেন আমরা বাস্তব জীবনে আমল করতে পারি, সেই তাওফীক কামনা করে দারস শেষ করছি।

www.icsbook.info

দুনিয়াদারদের প্রতি সতর্ক বাণী

সূরা তাকাছুর

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِا للّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ- حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ- كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ- ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ- كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ- لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ- ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ

সরল অনুবাদ ঃ ইরশাদ হচ্ছে (১) (হে মানব!) বেশী বেশী ধন-সম্পদ পাবার লোভে তোমাদেরকে (আল্লাহ্র ব্যাপারে) গাফেল করে রেখেছে। (২) এমনকি, (এই চিন্তায়)তোমরা কবরের মুখ পর্যন্ত পৌঁছে যাও। (৩) এটা কক্ষনও উচিত নয়। তোমরা খুব শীঘ্রই জানতে পারবে। (৪) অতঃপর এটা কক্ষনও উচিত নয়। তোমরা অতি শীঘ্রই জানতে পারবে। (৫) কক্ষনই নয়; যদি তোমরা (এই আচরণের পরিণতি) নিশ্চিত জানতে, (তা হলে তোমরা এ ধরনের আচরণ কখনই করতে না।) (৬) তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখতে পাবে। (৭) আবার(শোন), তোমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিত সহকারে অবশ্যই তা দেখতে পাবে। (৮) এরপর অবশ্যই সেদিন (বিচারের দিন) তোমাদেরকে এ সব নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

www.icsbook.info

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থঃ اَلْهٰكُمُ-তোমাদেরকে গাফেল রাখে। تَكَاثُرُ-বেশী বেশী ধন-সম্পদের লোভ বা লালসা। حَتّٰى-যতক্ষণ, এমনকি। -زُرْتُمُ তোমরা পৌছে যাও। مَقَابِرُ -কবরের মুখে । كَلَّا-কক্ষনও নয়। سَوْفَ-অতিসত্তর, শীঘ্রই। تَعْلَمُوْنَ-তোমরা জেনে নেবে বা জানতে পারবে। ثُمَّ-ফের, অতঃপর। لَوْ-যদি। عِلْمَ الْيَقِيْنِ-নিশ্চিত জ্ঞান। لَتَرَوُنَّ -তোমরা অবশ্যই দেখবে বা দেখতে পাবে। -الجحيم জাহান্নামের একটি স্তরের নাম। لَتَرَوُنَّهَا-অবশ্যই তোমরা তা দেখবে বা প্রত্যক্ষ করবে। عَيْنَ চোখে, দৃষ্টিতে। اَلْيَقِيْنِ-দিব্য প্রত্যয়, স্পষ্ট। لَتُسْئَلُنَّ-অবশ্যই তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে। يَوْمَئِذٍ-সেদিন (বিচারের দিন।) عَنْ-সম্পর্কে। النَّعِيْمِ। নেয়ামত বা অনুগ্রহ ।

সম্বোধনঃ উপস্থিত প্রিয় দ্বিনদার ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ভায়েরা/বোনেরা! আস্‌সালামু আলাইকুম অয়া রাহমাতুল্লাহি অয়া বরাকাতুহ্। আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কালামে হাকীমের ছোট্ট সূরা সমূহের মধ্যে সূরা তাকাছুর তেলাওয়াত এবং সরল অনুবাদ পেশ করেছি। আল্লাহ্ পাক যেনো আমাকে শেষ পর্যন্ত সঠিক ভাবে দারস পেশ করার তাওফীক দান করেন। **অমা তাওফীকি ইল্লাহ্ বিল্লাহ**।

সূরার নামকরণঃ সূরায় উল্লেখিত প্রথম আয়াতের (আত্‌তাকাছুর) শব্দটিকেহ্ প্রতিকি বা চিহ্ন হিসেবে নামরূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

সূরাটি নাযিলের সময় কালঃ আবু হাইয়্যান ও শওকানী বলেন, সকল মুফাস্‌সেরীনদের মতে এই সূরাটি মাক্কী। ইমাম সুয়ূতী (রঃ) বলেন, সব চেয়ে বেশী পরিচিত কথা হলো এই যে, এটি মাক্কী সূরা। তবে হাদীসের কোনো কোনো বর্ণনায় একে মদীনায় অবতীর্ণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

তথাপিও অধিকাংশ মুফাস্‌সেরীন এই সূরাটি মাক্কী হওয়ার ব্যাপারে একমত। এই তাফসীরকারকদের মতে সূরা 'তাকাছুর কেবল যে মক্কায় নাযিলকৃত সূরা তাই নয়, বরং এর বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য এবং এর বাচনভঙ্গি হতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এটি মক্কার প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরা সমূহের অন্যতম।

সূরাটির বিষয়বস্তুঃ মানুষ দুনিয়ার জিনাত বা সৌন্দর্যে এবং বৈষয়িক দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বেশী বেশী ধন-সম্পদ, মান-সম্মান লাভের আশায় এবং ভোগ বিলাসে এমন ভাবে মত্ত হয়ে পড়ে যে, একে অপরকে প্রতিযোগীতায় ছাড়িয়ে যাবার জন্য মাতুয়ারা হয়ে যায়। আর এসব জিনিস লাভ করে গর্ব-অহংকারে ফেটে পড়ে। তারা একক এই চিন্তায় এমন ভাবে মশগুল হয়ে পড়ে যে, শেষ পর্যন্ত তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে বেখেয়াল হয়ে যায়। তাদের এই চিন্তার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে এই সূরায় সতর্ক করা হয়েছে। এই সাবধানতার পর তাদেরকে এও সতর্ক করে দেয়া হয়েছে, তোমরা আল্লাহ্ পাকের অগনিত নেয়ামত ভোগ-ব্যবহার করছো, এগুলো তোমাদের পরীক্ষাও বটে। কিয়ামতের দিন তোমাদের কাছ থেকে প্রতিটি নেয়ামতের পাই পাই হেসাব নেয়া হবে।

ব্যাখ্যাঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত সূরা 'তাকাছুর'এর গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিবরণ পেশ করলাম। এখন আপনাদের সামনে সূরাটির বিভিন্ন শব্দ এবং আয়াতের ব্যাখ্যা পেশ করছি। আল্লাহ্ পাক সূরার প্রথমেই বলেনঃ

أَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ "বেশীবেশী ধন-সম্পদ লাভের লালসা তোমাদেরকে গাফেল করে রেখেছে।" প্রথম আয়াতের এই শব্দ দু'টির অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক, যা তার অন্তর নিহিত সব কথার তরজমা একটিমাত্র বাক্যে প্রকাশ করা খুব কঠিন ব্যাপার।

أَلْهٰكُمُ এর মূল রুট হলো لَهْوٌ যার অর্থ গাফলতি, বে-খেয়ালী,

www.icsbook.info

আত্মভোলা। কিন্তু আরবী ভাষায় এই শব্দটি বলা হয় এমন প্রতিটি ব্যস্ততা বোঝানোর জন্যে যার প্রতি মানুষ গভীরভাবে আকৃষ্ট হয় এবং তার আকর্ষণে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বা বিষয় হতে সম্পূর্ণ বে-খেয়াল হয়ে পড়ে। এ থেকে اَلْهٰكُمُ শব্দ বানালে এর তাৎপর্য হবে- কোনো বিশেষ বে-খেয়ালী তোমাদেরকে এমনভাবে গ্রাস করে ফেলেছে যে, তার চেয়ে আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের প্রতিও তোমাদের খেয়াল থাকে না। তোমাদের ঘাড়ের উপর যেনো সেই জিনিসের ভূত সওয়ার হয়ে আছে। তার চিন্তা-ভাবনায় তোমরা দিন-রাত মশগুল হয়ে থাকো। আর মানসিকভাবে তোমরা এমন ভাবে জড়িয়ে গিয়েছো যে, তোমাদেরকে একেবারে গাফেল বানিয়ে দিয়েছে।

تَكَاثُرْ এর মূল রুট كَثْرَتٌ এর তিনটি অর্থ ঃ

এক. অতিমাত্রায় বেশী বেশী লাভ করার চেষ্টা-তদবীরে লেগে থাকা।

দুই. অতি মাত্রায় বেশী বেশী লাভের জন্যে পরস্পরে প্রতিযোগীতা করা এবং একে অপরকে পেছনে ফেলে দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা-ফেকের করা।

তিন. একে অপরের তুলনায় বেশী পাবার কারণে এই বলে গর্ববোধ করা যে, সে অন্যদের চেয়ে অনেক বেশী লাভ করেছে।

সুতরাং اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرْ আয়াতের অর্থ হলোঃ বেশী বেশী পাবার চিন্তা তোমাদেরকে এমনভাবে মশগুল করে ফেলেছে যে, ওর নেশায় তোমাদেরকে তার চেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হতে গাফেল ও বে-খেয়াল করে দিয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার এই আয়াত তেলাওয়াত করে বললেনঃ এর অর্থ হলো"হারাম পথে সম্পদ যোগাড় করা এবং আল্লাহ্র নির্ধারিত খাতে ব্যয় না করা"। (কুরতবী)।

আয়াতে কোন্ জিনিস পাবার লোভের কথা বলা হয়েছে ?

আয়াতে দুনিয়ার সব জিনিসের সুযোগ-সুবিধা, স্বার্থ, বিলাস-সামগ্রী, স্বাদ-আস্বাদনের উপায়-উপকরণ এবং শক্তি ও ক্ষমতার উৎস বেশী বেশী লাভ করার চেষ্টা সাধনা করা। তা লাভের জন্যে প্রতিযোগীতায় অন্যদের চেয়ে বেশী এগিয়ে যাবার চেষ্টা করা এবং অন্যদের চেয়ে বেশী পাবার জন্য গর্ববোধ করার কথা বলা হয়েছে।

আয়াতে কাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে ?

আয়াতে বেশী বেশী দুনিয়ার স্বার্থ লাভ এবং সেই জিনিস পাবার জন্যে প্রতিযোগীতায় নেমে পড়া, অন্যদের তুলনায় বেশী লাভের জন্য গর্ববোধ করার এই কথা বিশেষ কোনো ব্যক্তিকে বলা হয়নি। বরং প্রত্যেক ব্যক্তি এবং জাতিকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে।

আয়াতে কিসে থেকে গাফেলের কথা বলা হয়েছে ?

আয়াতে মানুষকে বেশী বেশী প্রাচুর্য লাভের নেশা গাফেল করে দিয়েছে বলা হয়েছে। কিন্তু কিসে থেকে গাফেল করে দেয়া হয়েছে তা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। ফলে এর তাৎপর্য অত্যন্ত ব্যাপক। "তাকাছুর" বেশী বেশী পাবার লোভ এমন প্রতিটি জিনিস হতে তাদেরকে গাফেল করে দিয়েছে যা তার তুলনায় বেশী গুরুত্বপূর্ণ। যেমন তাদেরকে আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগী, আইন-বিধান কায়েমের ব্যাপারে গাফেল করে রেখেছে, পরকালের জবাবদিহি এবং তার পরিণতির ব্যাপারে গাফেল করে রেখেছে, নৈতিক সীমা ও নৈতিক দায়-দায়িত্বের দিক দিয়েও গাফেল রেখেছে। হকদারের হক এবং তা ঠিকঠিক ভাবে আদায় করার ব্যাপারেও তারা গাফেল রয়েছে। নিজের জীবনের মান উন্নত করার চিন্তা-ভাবনায় তারা মশগুল। কিন্তু মনুষ্যত্বের মান যে কতখানি নীচে নেমে গেছে, তার চিন্তা থেকেও তারা গাফেল হয়ে পড়েছে। গাড়ী-বাড়ি, টাকা-কড়ি, ধন-সম্পদ কেমন করে বেশী বেশী কামায় করা যায় সেই চিন্তায় তারা দিশেহারা। কিন্তু কোন্ উপায়ে পাওয়া যাবে, আবার সেই উপায়গুলো হালাল না হারাম সে ব্যাপারে তাদের কোনই চিন্তা-বিবেচনা নেই।

আনন্দ-ফূর্তি, সুখ-শান্তি এবং দৈহিক স্বাদ-আস্বাদনের উপায় উপকরণ তাদের পেতে হবে, কিন্তু এর পরিণাম যে কতো ভয়াবহ সে ব্যাপারেও তারা গাফেল হয়ে পড়েছে। এক দেশ আর এক দেশের চেয়ে বেশী বেশী শক্তি, সৈন্য-সামন্ত এবং অত্যাধুনিক মারনাস্ত্র সংগ্রহের জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে, এ জন্যে তারা চরম প্রতিযোগীতায় নেমে পড়েছে। শক্তিধর দেশের তালিকায় নাম লেখার জন্যে এ্যাটম বোমার পর আনবিক ও রাষায়নিক বোমা পরীক্ষার মহড়ায় আত্মনিয়োগ করেছে। কি করে বেশী বেশী অস্ত্র সংগ্রহ করা যায়, তার জন্য দিন-রাত মশগুল ও পেরেশান হয়ে আছে। কিন্তু এসবের দ্বারা আল্লাহ্‌র এই জমীনে ব্যাপক যুলুম-নির্যাতনে 'যে কতো বনি আদম ধ্বংস হয়ে মানবতা ভুলণ্ঠিত হচ্ছে, সেই কথা একবারেও তাদের মনের মধ্যে উদয় হয় না। এক কথায় 'তাকাছুর'. বেশী বেশী পাবার লোভ অনেক রকমের, অনেক ধরনের ও নানা রূপের এবং তা দুনিয়ায় ব্যক্তি, জাতি, গোষ্ঠী ও দেশ সকল বিষয়ই এর মধ্যে নিহিত রয়েছে। ফলে দুনিয়া-দুনিয়ার স্বার্থ ও সুখ-শান্তির উর্ধে অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের প্রতিও তাদের এক বিন্দু ভ্রুক্ষেপ নেই। অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ **এমনকি, তোমরা কবরের মুখ পর্যন্ত পৌঁছে** যাও। এখানে কবর পর্যন্ত পৌঁছে যাও অর্থ মরে কবরে পৌঁছা। অর্থাৎ তোমরা নিজেদের গোটা জীবনটায় এই চিন্তায় কাটিয়ে দাও এবং মরার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তোমরা এই চিন্তা থেকে অবসর পাওনা। এর তাফসীর প্রসঙ্গে মহানবী (সাঃ) এক হাদীসে বলেনঃ حَتّٰى يَأْتِيَكُمُ الْمَوْتُ এমনকি তোমাদের মরণ এস যায়। (ইবনে কাসীর)। সুতরাং আয়াতের মর্মার্থ হলো, এই ধন-সম্পদের প্রাচুর্য অথবা ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও বংশ গোত্রের বড়াই তোমাদেরকে গাফেল ও উদাসীন করে রাখে। নিজেদের পরিনতি ও পরকালের হেসাব-নেকাশের কোনো চিন্তা তোমরা করো না। আর এমনি অবস্থায় তোমাদের মরণ

এসে হাজির হয়ে যায়। আর মরণের পর তোমরা কঠিন আযাবে গ্রেফতার হয়ে যাও।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে শিখ্খীর (রাঃ) বলেনঃ আমি এক দিন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) -এর দরবারে হাজির হয়ে দেখলাম, তিনি " اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ " তেলাওয়াত করে বললেনঃ "মানুষ বলে আমার ধন, আমার ধন, অথচ তোমার অংশ তো ততটুকুই যতটুকু তুমি খেয়ে শেষ করে ফেলো কিম্বা (পোশাক)পরে ছিঁড়ে ফেলে দাও অথবা সদ্কা করে (আখেরাতের জন্য) সামনে পাঠিয়ে দাও। এছাড়া যা আছে, তা হাত থেকে চলে যাবে তুমি অপরের জন্যে ছেড়ে চলে যাবে। [ইবনে কাসীর (তিরমিযী, আহমদ।)]
অন্য এক হাদীসে হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ

আদম সন্তান যদি দুই উপত্যকা পরিমান ভর্তি সম্পদ পায়, তবুও সে তৃতীয় উপত্যকা কামনা করবে। আদম সন্তানের পেট মাটি ছাড়া অন্য কোনো কিছু দিয়ে ভর্তি করতে পারে না। (বুখারী)।

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, মানুষ দুনিয়াতে এমন ভাবে মত্ত হয়ে আছে যে, আল্লাহ্ এবং আখেরাতের জবাব দিহীতাকে বিলকুল ভুলে গিয়ে হায়াতের এই জিন্দেগীটুকু ফুরিয়ে ময়ূত এসে হাজির হয়ে যাবে।

এই জন্য আল্লাহ্ পাক সন্তান-সন্ততি এবং ধন-সম্পদকে ফেৎনা বা পরীক্ষা বলে উল্লেখ করে বলেনঃ

اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ **নিশ্চয় তোমাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি ফেৎনা বা পরীক্ষার বস্তু।** (তাগাবুন ১৫) সুতরাং এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ পাক মুমিনদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ–

হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্তুতির (মহব্বত) যেনো তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে গাফেল করে না দেয়। যারা এ কারণে গাফেল হবে, তারাই হবে (আখেরাতে) ক্ষতিগ্রস্ত। (মুনাফিকুন-৯) অতঃপর আল্লাহ্‌ পাক বলেন ঃ

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ **কক্ষনই নয়। অতি শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে।** আয়াতে দুনিয়াদার লোকদের সতর্ক করে বলা হয়েছে, আসলে তোমরা মস্ত বড় ভুলের মধ্যে পড়ে আছো। তোমরা মনে করে নিয়েছো যে, দুনিয়ার এই অর্থ-কড়ি, গাড়ী-বাড়ি, ধন-দৌলতের প্রাচুর্যের বিপুলতা এবং আরও বেশী বেশী লাভ করতে পারা-ই-বুঝি প্রকৃত উন্নতি এবং সফলতা। অথচ এটা কখনই প্রকৃত উন্নতি এবং সফলতা নয়। দুনিয়ার এই চমক লাগানো উন্নতি ও সফলতার পরিণতি যে কতো মারাত্মক ও ভয়াবহ তা তোমরা খুব শীঘ্রই জানতে পারবে। তাছাড়া তোমরা যে, কতো বড় ভুল ও মারাত্মক বিভ্রান্তির মধ্যে জীবন অতিবাহিত করছো তা তোমাদের কাছে খুব তাড়াতাড়ি পরিস্কার হয়ে যাবে।

سَوْفَ **অতি তাড়াতাড়ি** বলতে পরকালও হতে পারে আবার মরণও হতে পারে। কেননা মানুষের মরণ যে কোনো মুহূর্তে ঘটে যেতে পারে। সুতরাং এটা মানুষের জন্য অতি নিকটে। আবার প্রতিটি মানুষ মরার সাথে সাথে জানতে পারবে, দুনিার জীবনের ভোগ-বিলাস এবং ব্যস্ততা তার জন্য পরম সৌভাগ্যের বিষয় ছিলো, না তার জন্যে চরম দুর্ভোগের কারণ ছিলো ?

ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ **আবার (শোন) কক্ষন-ই-নয়। তোমরা অতি শীঘ্রই জানতে পারবে।** এই আয়াতে পূর্বের বিষয়গুলো যে অতি গুরুত্বপূর্ণ তা মানুষের মনের মধ্যে গেঁথে দেবার জন্যে এবং আরও বেশী সতর্ক করার জন্য-ই পুনরায় একই কথা রিপিটেসান (পুনরাবৃত্তি) করা হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ্‌ পাক বলেনঃ

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ

www.icsbook.info

"কক্ষন-ই নয় যদি তোমরা নিশ্চিত জানতে।" আয়াতে لَوْ এর জবাব এখানে উহ্য আছে। অর্থাৎ اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা যদি কেয়ামতের হেসাব-নেকাশে দৃঢ় বিশ্বাসী হতে, তবে কখনও তোমরা তোমাদের ধন-দৌলত টাকা-পয়সা গাড়ী-বাড়ির বড়াই করতে না এবং আল্লাহ্ এবং পরকালের হেসাব-নেকাশ সম্পর্কে একেবারেই গাফেল বা উদাসীন হতে না। অতঃপর আল্লাহ্পাক তাদের পরিণতি সম্পর্কে বলেনঃ

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ- **তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে।**

আয়াতে এখানে যারা দুনিয়াদারীতে মাতুয়ারা হয়ে যায় এবং আল্লাহ্র বিধি-বিধান থেকে দূরে সরে যায়, আখেরাতে তাদেরকে তাঁরই সামনে হাজির হতে হবে এবং তাঁর কাছেই জবাবদিহী করতে হবে, এই অনুভূতিটুকুও জাগে না, তাদেরই সাথে জাহান্নামের স্বাক্ষাৎ ঘটবে। অর্থাৎ তাদেরকে জাহান্নামের একটি স্তর 'জাহীম' নামক দোযখে অবস্থান করতে হবে। অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ **অতঃপর তোমরা নিশ্চিত সহকারে সরাসরি দেখতে পাবে।** عَيْنَ الْيَقِيْنِ এর অর্থ-সেই প্রত্যয় বা বিশ্বাস, যা চাক্ষুষ দেখার মাধ্যমে অর্জিত হয়। এটা বিশ্বাসের সর্বোচ্চ পর্যায়। না দেখে বিশ্বাস, আর সরাসরি দেখে বিশ্বাস-এর মধ্যে পার্থক্য আছে। যেমন- উদাহরণ হিসেবে বলা যায় হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ মূসা (আঃ) যখন তুর পাহাড়ে (৪০দিন) অবস্থান করছিলেন, তখন আল্লাহ্ তাআলা তুর পাহাড়েই তাকে (অহীর দ্বারা) অবহিত করেছিলেন যে, বনী ইসরাঈলেরা গরুর বাছুরের পূজায় জড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু "মূসা (আঃ)-এর মধ্যে" এ বিষয়ে তেমন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি, যেমন ফিরে এসে স্বচক্ষে দেখার পর (প্রতিক্রিয়া) দেখা দিয়েছিলো। তিনি তাদের এই আচরণে রাগে তওরাতের তক্তিগুলো (যাতে তাওরাত লেখা ছিলো) হাত থেকে ফেলে দিয়েছিলেন" (মাযহারী)।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক তাঁর নেয়ামতের বিষয়ে বলতে গিয়ে বলেনঃ

ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ

অতঃপর সেই (বিচারের) দিন তোমাদেরকে প্রতিটি নেয়ামতের (ব্যবহার) সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সূরার সব শেষ আয়াতে আল্লাহ্র নেয়ামত বা অনুগ্রহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে এটা মনে করা ঠিক হবে না যে, যেহেতু আগে জাহান্নামে যাবার কথা বলা হয়েছে বিধায় জাহান্নামে যাবার পরই বুঝি নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, আসলে তা নয়। এই জিজ্ঞাসাবাদ তো হাশরের মাঠে আল্লাহ্র আদালতের হেসাব নেবার সময় অনুষ্ঠিত হবে। তা হলে কথার অর্থ মোটামুটি এই দাঁড়ায়, তোমাদের এই সংবাদ দিচ্ছি যে, এই নেয়ামত বা অনুগ্রহ সমূহ সম্পর্কে তোমাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

মুমিন কাফের সকলকে নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবেঃ

নেয়ামতের জিজ্ঞাসাবাদ সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) এর যে সব হাদীস বর্ণিত হয়েছে তাতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলা দুনিয়ায় মানুষকে যেসব নেয়ামত দান করেছিলেন, সেই সব বিষয়ে মু'মিন ও কাফের সকলকেই আল্লাহ্র দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। তবে যারা আল্লাহ্র প্রতি অকৃতজ্ঞতা দেখায়নি, বরং শোকর গোজার হয়ে জীবন অতিবাহিত করেছে, এই জিজ্ঞাসাবাদে তারা পুরোপুরি উত্তীর্ণ হবে। অপর পক্ষে যারা আল্লাহ্র এই নেয়ামত সমূহের হক আদায় করেনি, তা যথাযথ ভাবে ব্যবহার করেনি এবং কথায় -কাজে আল্লাহ্র নাশোকরি করেছে, তারা এই জবাবদিহি হতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যাবে। হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবর নবী করীম (সাঃ) আমাদের ঘরে আসলেন। আমরা তাঁকে সদ্য তোলা টাট্কা খেজুর খেতে দিলাম এবং ঠান্ডা পানি পান করতে দিলাম। তখন নবী করীম (সাঃ) বললেন, "এটা সেই নেয়ামত যে বিষয়ে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। (মুসনাদে আহমদ, নাসায়ী, বায়হাকী।)

অপর হাদীসে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ "নবী করীম (সাঃ)

www.icsbook.info

হযরত আবু বকর ও হযরত ওরম (রাঃ)-কে বললেনঃ চলো আমরা আবুল হাই সাম ইবনে তীহান আনসারীর ঘরে যাই। তিনি তাঁদেরকে সাথে নিয়ে ইবনে তীহানের খেজুর বাগানে হাজির হলেন। ইবনে তীহান এক ছড়া খেজুর তাঁদের সামনে এনে রাখলেন। নবী করীম (সাঃ) বল-লেনঃ তুমি কেনো নিজে খেজুরগুলো ছড়া থেকে ছিড়ে আনলেনা ? তিনি জবাব দিলেন, আমি চাই আপনারা নিজেরাই বেছে বেছে নিজ হাতে ছিঁড়ে খান। অতঃপর তাঁরা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেজুর খেলেন এবং ঠান্ডা পানি পান করলেন। খেয়ে-দেয়ে নবী করীম (সাঃ) বললেনঃ "যার হাতে আমার জীবন তাঁর কসম করে বলছি, এই নেয়ামতগুলো সম্পর্কে তোমাদেরকে কেয়ামতের দিন জবাবদিহি করতে হবে-এই শীতল ছায়া, এই ঠান্ডা পানি।"(মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী)। হাদীসের এসব বর্ণনা থেকে অকাট্য ভাবে জানা যায় যে, আল্লাহ্র দেয়া নেয়ামতসমূহ সম্পর্কে কেবল কাফেরদের কাছেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না, বরং নেক্কার মুমিনদেরকেও এই বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে।

কোন্ কোন্ নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ?

মানুষকে দেয়া আল্লাহ্র নেয়ামতের কোনো সীমা সংখ্যা বা পরিমাণ নেই। তবে তার মধ্যে কিছু নেয়ামতের কথা আল্লাহ্পাক আল-কুরআনে উল্লেখ করে বলেনঃ

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

এতে মানুষের শ্রবনশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও হৃদয় সম্পর্কিত লাখো নেয়ামত অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়, যেগুলো সে প্রতি মুহূর্তে ভোগ ব্যবহার করে।

আবার অনেক নেয়ামত এমন আছে যা মানুষের জানা নেই। তার পরিমাণ বা সংখ্যা শুধু নয় তার অস্তিত্ব সম্পর্কেও মানুষ অবহিত বা সচেতন নয়। আল্লাহ্পাক বলেনঃ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا

তোমরা যদি আল্লাহ্র নেয়ামত সমূহ গুনতে চাও, তবে তা তোমরা

গুনে গুনে কিছুতেই শেষ করতে পারবে না। (ইব্রাহীম-৩৪)

নেয়ামতের প্রকারঃ আল্লাহ্‌র নেয়ামত সমূহের মধ্যে অনেক নেয়ামত এমন- যা আল্লাহ্ তাআলা নিজ হতেই সরাসরিভাবে মানুষকে দান করেছেন। যেমন মানুষের দেহের কাঠামো এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, আস-মান, জমীন এবং মাটির নীচের নেয়ামত সমূহ। আর অনেক অনেক নেয়ামত এমন যা মানুষ তা উপার্জনের মাধ্যমে অর্জন করে। যেমন জ্ঞান বিজ্ঞান, ধন-সম্পদ, প্রযুক্তি ইত্যাদি।

মানুষের অর্জিত নেয়ামত সমূহ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে সে তা কোন্ পথে বা পন্থায় আয়ত্ব করেছে এবং কোন্ পথে ও খাতে তা ব্যয়-ব্যবহার করেছে ? আর আল্লাহ্‌র সরাসরি দেয়া নেয়ামত সমূহ সম্পর্কে হেসাব দিতে হবে- সেগুলোকে সে কিভাবে কাজে লাগিয়েছে ও ভোগ-ব্যবহার করেছে এবং কোন্ কাজে ব্যয়-খরচ করেছে? মোট কথা সকল প্রকারের নেয়ামত সম্পর্কেই মানুষকে কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র দরবারে পুঙ্খানু-পুঙ্খভাবে জবাবদেহী করতে হবে।

নেয়ামত সমূহের শোকরিয়া আদায়ের পদ্ধতিঃ আল্লাহ্ তাবারাক ওয়াতাআলা আশ্‌রাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ জাতির ভোগ-ব্যবহার এবং কল্যাণের জন্যেই অসংখ্য নেয়ামত দান করছেন। সাথে সাথে কেয়ামতের হেসাবের দিন প্রতিটি নেয়ামতের শোকরিয়া আদায় করেছে কি না সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। সুতরাং মানুষের জানা থাকা জরুরী যে কিভাবে সে তার শোকরিয়া আদায় করবে। নেয়ামতের শোকরিয়া আদায় তিনটি পদ্ধতিতে করা যায়।

প্রথম পদ্ধতি হলো ইলম বা জ্ঞান ঃ শোকরিয়া আদায় করতে হলে প্রথমেই মানুষের মধ্যে সেই ইলম বা জ্ঞানটুকু থাকতে হবে যে আল্লাহ্‌র নেয়ামতগুলো কি কি এবং কোন্‌টা কিভাবে ব্যয়-ব্যবহার খরচ এবং প্রয়োগ করতে হবে ? এজন্যই ইলমের প্রয়োজন। রাসূল (সাঃ) জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন ঃ

www.icsbook.info

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمِيْنَ (وَفِىْ رِوَيَةٍ) مُسْلِمَتٍ

প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ (অন্য বর্ণনায় আছে)এবং নারীর জন্য জ্ঞান অর্জন করা ফরয।

দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো আমল ঃ বাস্তব জেন্দেগীতে তা প্রয়োগ করতে হবে। নেয়ামত সমূহের জ্ঞান এবং ব্যয়-ব্যবহার ও প্রয়োগের জ্ঞান লাভের পর তা দুনিয়ার জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে। জানার পর আমল না করা আরো মস্তবড় অপরাধ। যারা মুখে বলে কিন্তু কাজে করে না তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ-

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ-

তোমরা যা কারো না, তা বলা আল্লাহ্র কাছে খুবই অপছন্দনীয়। (সফ্ফ-৩)

তৃতীয় পদ্ধতি হলোঃ নেয়ামতের জ্ঞান অর্জন এবং আমল বা বাস্তব জীবনে প্রয়োগের সময় তার টার্গেট থাকবে একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। নেয়ামতের শোকরিয়া আদায়ের সময় দুনিয়ার খেয়াল-খুশি থাকবে না। থাকবে না কোনো গর্ব-অহংকার। বরং অত্যন্ত বিনয়, নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তা বাস্তব জীবনে ব্যয়-ব্যবহার এবং প্রয়োগ করতে হবে। কেননা কেয়ামতের দিন হেসাব-নেকাশ নেবার সময় আল্লাহ্ পাক মানুষের দু'টি বিষয়কেই একমাত্র গুরুত্ব দেবেন যেমন- রাসূল (সাঃ) বলেনঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلٰى صُوَرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَلٰكِنْ يَّنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ

নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা কেয়ামতের (হেসাব-নেকাসের) দিন তোমাদের চেহারার রূপ সৌন্দর্য ও ধন-সম্পদের দিকে লক্ষ্য করবেন

www.icsbook.info

না বা গুরুত্ব দেবেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তরের নিয়াত ও নিষ্ঠা এবং আমল বা কার্যক্রমের দিকে লক্ষ্য করবেন বা গুরুত্ব দেবেন। [আবু হুবাইয়া রাঃ (মুসলিম)]।

প্রকৃত শোকরিয়া আদায়ঃ আল্লাহ্‌র নেয়ামতের প্রকৃত শোকরিয়া আদায় হলো, আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান মেনে চলে, সেই প্রকৃত আল্লাহ্‌র নেয়ামতের শোকরিয়া আদায় করে; আর যে আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান মেনে চলে না, সে আল্লাহ্‌র নেয়ামতের শোকরিয়া আদায় করতে পারে না। আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

وَاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ

যদি তোমরা আল্লাহ্‌রই ইবাদত করে থাকো, তা হলে তাঁর নেয়ামতের শোকর গোজার করো। (নাহল-১১৪)। কিন্তু আল্লাহ্‌র নেয়ামতের প্রকৃত শোকরিয়া আদায়কারী লোকের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। আল্লাহ্ পাক বলেনঃ قَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ

বলুন, (হে রাসূল) আসলে কৃতজ্ঞ বান্দার সংখ্যা খুবই কম।

সুতরাং নেয়ামতের বিস্তারিত আলোচনায় এটাই বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ পাকের প্রতিটি নেয়ামতের শোকরিয়া আদায় করতে হলে সমাজে আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান তথা আল-কুরআনের আইন চালু থাকতে হবে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা ছাড়া কোনো ভাবেই আল্লাহ্‌র নেয়ামতের প্রকৃত শোকর গোজারী হওয়া সম্ভব নয়। এজন্য যেখানে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা চালু নেই সেখানে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য জান-প্রাণ এবং ধন-সম্পদ দিয়ে জিহাদ বা সংগ্রাম, আন্দোলন করা সব ফরজের বড় ফরজ।

শিক্ষাঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! সূরা তাকাছুরের বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে যেসব শিক্ষা পাওয়া যায় তা হলো ঃ

❒ দুনিয়াকে ভোগের স্থান বানানো যাবে না, বরং আখেরাতে নাজাতের ক্ষেত হিসেবে কাজে লাগাতে হবে।

❒ ধন-সম্পদের প্রাচুর্য গড়ার জন্য আত্মনিয়োগ করা যাবে না।

❒ একটার পর আর একটা গাড়ী-বাড়ীর মডেল চেঞ্জ করার প্রতিযোগিতায় নামা যাবে না।

❒ আল্লাহ্ যদি নেয়ামত হেসেবে বৈধ পথে অর্থ-সম্পদ দান করেন তার জন্য গর্ববোধ না করে বরং আল্লাহ্র বেশী বেশী খরচ করতে হবে এবং শোকরিয়া আদায় করতে হবে।

❒ দুনিয়ার আকর্ষণে ভুলে গিয়ে দুনিয়ায় ডুবে যাওয়া যাবে না। নৌকা যেমন পানির উপর দিয়ে চলে কিন্তু ডুবে যায় না। তেমনি মানুষকে দুনিয়াতেই চলতে হবে, ডুবে যাওয়া যাবে না। নৌকা যেমন পানিতে ডুবে গেলে ধ্বংস হয়ে যায়, তেমনি মানুষও যদি দুনিয়ায় ডুবে যায় তবে তারও ধ্বংস অনিবার্য।

❒ হালাল বা বৈধ পথে আয়-উপার্জন করতে হবে এবং বৈধ ও কল্যাণকর কাজে ব্যয় করতে হবে।

❒ দুনিয়ার সফলতা প্রকৃত সফলতা নয় বরং আখেরাতের সফলতাকেই প্রকৃত সফলতা মনে করতে হবে।

❒ আল্লাহ্র ভয় সবসময় দেলের মধ্যে রাখতে হবে এবং মরণকে স্মরণ রাখতে হবে।

❒ আল্লাহ্র নেয়ামতের শোকরিয়া আদায়ের জন্য জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে বাস্তব জীবনে তা আমল করতে হবে।

❒ নেয়ামতের প্রকৃত শোকর গোজারী হবার জন্য আল্লাহ্র প্রতিটি বিধি-বিধান ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে মানার জন্য আল্লাহ্র এই জমীনে আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরীক থাকতে হবে।

www.icsbook.info

❑ সুখে-দুঃখে সকল অবস্থায় আল্লাহ্‌র শোকরিয়া আদায় করতে হবে সরাসরি আল্লাহ্‌র দেয়া নেয়ামত হোক অথবা মানুষের অর্জিত নেয়ামত হোক, প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র প্রশংসা স্বরূপ **আলহামদুল্লিাহ্‌** বলে মৌখিক স্বীকৃতি দিতে হবে এবং কাজে পরিণত করতে হবে।

আহবানঃ সম্মানিত ভায়েরা/বোনেরা! আম্মাপারার এই সূরাটির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে যদি আমার অজান্তে বা অজ্ঞাতে কোনো ভুল-ত্রুটি হয়ে যায়, তার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর এই সূরার মধ্যে যেসব শিক্ষা আমরা লাভ করলাম, তা যেনো বাস্তব জীবনে আমল করতে পারি সেই তৌফিক কামনা করে দর্‌স শেষ করছি। "অয়া আখেরু দাওয়ানা আনিল হামদু-লিল্লাহি্‌ রাব্বিল আ'লামীন।"

ছয়

ইসলামী আন্দোলনঃ কর্মীদের গুণাবলী

সূরা মায়েদাহ-৫৪-৫৬

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِا للّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗٓ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ- اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ- وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ-

সরল অনুবাদঃ ইরশাদ হচ্ছেঃ (৫৪) হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্যে থেকে যদি কেউ নিজের দ্বীন হতে ফিরে যায়, তবে অচিরেই আল্লাহ্ তাআলা (তাদের স্থলে) এমন অনেক লোক পয়দা করবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসবে এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসবেন। তারা মুমি-নদের প্রতি হবে নম্র ও বিনয়ী এবং কাফেরদের প্রতি হবে অত্যন্ত কঠোর ও কঠিন। তারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ (সংগ্রাম) করবে এবং কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারের পরোয়া করবে না। এটা আল্লাহ্

www.icsbook.info

পাকের দয়া, তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আর আল্লাহ্ তাআলা বিশাল প্রাচুর্যের মালিক, মহাজ্ঞানী। (৫৫) (হে মুমিনগণ!) তোমাদের বন্ধু ও অভিভাবক তো কেবলমাত্র আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং সেইসব ঈমানদার লোক যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ্র সামনে নত থাকে। (৫৬) আর যারা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং মুমিনদেরকে বন্ধু ও অভিভাবক হিসেবে বরণ করে; তারাই আল্লাহ্র দল এবং পরিণামে তারাই হবে বিজয়ী।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থঃ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ-ওহে তোমরা যারা। اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছো। مَنْ-যে। يَرْتَدَّ-ফিরে যাবে। مِنْكُمْ-তোমাদের মধ্য থেকে। عَنْ-হতে, থেকে। دِيْنِهٖ-তার দ্বীন বা ধর্ম। فَسَوْفَ-অতিসত্তর বা শীঘ্রই। يَاْتِى اللّٰهُ-আল্লাহ্ আনবেন বা পয়দা করবেন। بِقَوْمٍ-জাতি বা সম্প্রদায়। يُّحِبُّهُمْ-তাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন। وَ এবং। يُحِبُّوْنَهٗ-তারা তাঁকে ভালোবাসবে। اَذِلَّةٍ -বিনয়-নম্র। عَلٰى-উপর, এখানে প্রতি। اَعِزَّةٍ-কঠিন, কঠোর। يُجَاهِدُوْنَ-তারা -জিহাদ (সংগ্রাম) করে। فِىْ-মধ্যে। سَبِيْلِ اللّٰهِ-আল্লাহ্র পথে। لَا না। يَخَافُوْنَ–তারা ভয় পায়। لَوْمَةَ -তিরস্কার বা ভর্ৎসনা। لَائِمٍ - তিরস্কারকারী বা বিদ্রুপকারী। ذٰلِكَ-ওটা বা এটা। فَضْلُ اللّٰهِ - আল্লাহ্র অনুগ্রহ বা দয়া। يُؤْتِيْهِ -তিনি তাদেরকে দেন বা দান করেন। مَنْ يَّشَاءُ -যাকে ইচ্ছা। وَاسِعٌ -ঐশ্বর্য্য বা প্রাচুর্য। عَلِيْمٌ-মহাজ্ঞানী। اِنَّمَا-নিশ্চয় যারা। وَلِيُّكُمْ-তোমাদের বন্ধু বা অভিভাবক। وَرَسُوْلُهٗ -তাঁর রাসূল। يُقِيْمُوْنَ-তারা প্রতিষ্ঠা করে। اَلصَّلٰوةَ-নামায। وَيُؤْتُوْنَ-তারা দেয় বা আদায় করে। هُمْ-তারা। رٰكِعُوْنَ -বিনয়ী-

অবনমিত। وَمَنْ–এবং যে। يَّتَوَلَّ اللّٰهَ-আল্লাহ্কে বন্ধু বা অভিভাবক বানায়। وَرَسُوْلَهٗ-তাঁর রাসূল। فَاِنَّ-অতঃপর নিশ্চয়। حِزْبَ দল هُمُ الْغٰلِبُوْنَ-তারাই হবে বিজয়ী।

সম্বোধনঃ উপস্থিত ইসলামী আন্দোলনের কর্মী/ ইসলাম প্রিয় মু'মিন ভায়েরা/বোনেরা/ ভাই ও বোনেরা! আস্সালামু আলাইকুম অয়া রাহমাতুল্লাহি অয়া বারাকাতুহ্। প্রিয় ভায়েরা! আমি আপনাদের সামনে পবিত্র আল-কুরআনের সূরা মায়িদার ৫৪ থেকে ৫৬ মোট তিনটি আয়াত তিলাওয়াত ও সরল অনুবাদ পেশ করেছি। আল্লাহ্ পাক যেনো আমাকে আপনাদের সামনে শেষ সময় পর্যন্ত দারস পেশ করার তাওফিক দান করেন। আমীন।

সূরার নামকরণঃ সূরায় উল্লেখিত اَلْمَائِدَةٌ (আল-মায়েদাহ্) **শব্দটিকেই** এই সূরার নাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। مَائِدَةٌ- (আল-মায়িদাহ্) অর্থ দস্তরখানা বা যার উপর খাবার খাওয়া হয়। অন্যান্য অধিকাংশ সূরার মতই এই সূরাও নামের সাথে বিষয় বস্তুর তেমন কোনো মিল নেই। অন্যান্য সূরা থেকে পৃথক করে পরিচিতির জন্যই চিহ্ন ও নিদর্শন হিসেবে এই নাম গ্রহণ করা য়েছে। (সূরার নামকরণ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য ১নং দারসে দেখুন।)

সূরাটি নাযিল হবার সময়কালঃ সর্বসম্মত ক্রমে সূরাটি মাদানী। কেউ কেউ একে কুরআন মজীদের সর্বশেষ সূরাও বলেছেন। মুসনাদে আহমদ কিতাবে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) ও আস্মা বিনতে ইয়াজীদ (রাঃ) এর বর্ণনায় বর্ণিত আছে; সূরা মায়িদাহ্ যে সময় নাযিল হয়, সে সময় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সফরে 'আযবা' নামক উটের পিঠে চড়ে ছিলেন। সাধারণত রাসূর (সাঃ) এর উপর ওহী নাযিলের সময় যেরূপ অসাধারণ ভারী ও বোঝামনে হতো, তখনও তাই মনে হচ্ছিল। এমনকি ওহীর ওজনের চাপে উট বসে পড়ার উপক্রম হলে রাসূল (সাঃ) নীচে নেমে

পড়েন। কোনো কোনো বর্ণনার দৃষ্টিতে বোঝা যায় যে, এটি ছিলো বিদায় হজ্বের সফর। আর বিদায় হজ্ব ৯ম হিজরীর ঘটনা। এই হজ্ব থেকে ফিরে আসার পর হুজুর(সাঃ) ৮০ দিন বেঁচে ছিলেন। ইবনে হাব্বান 'বাহরে মুহীত' গ্রন্থে উল্লেখ করেন; সূরা মায়েদাহ্র কিছু অংশ হোদায়বিয়ার সন্ধির সফরে, কিছু অংশ মক্কা বিজয়ের সফরে এবং কিছু অংশ বিদায় হজ্বের সফরে নাযিল হয়। এতে বোঝা যায় যে, এ সূরাটি সর্বশেষ না হলেও শেষ দিকে অবতীর্ণ হয়।

'রুহুল মা'আনী' গ্রন্থে আবু ওবায়দাহ্ হামযা ইবনে হাবীব এবং আতিয়্যা ইবনে কায়স বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, সূরা মায়েদাহ্ কুরআন নাযিলের শেষ পর্যায়ে নাযিল হয়েছে। এতে যা হালাল করা হয়েছে, তা চিরকালের জন্যে হালাল করা হয়েছে এবং যা হারাম করা হয়েছে, তা চিরকালের জন্যে হারাম করা হয়েছে। মোট কথা চূড়ান্ত হালাল-হারামের ঘোষণা এই সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে।

সূরার বিষয়বস্তুঃ সূরা মায়েদার বিষয়বস্তুকে তিনটি অংশে বিভক্ত করা যেতে পারে।

এক. মুসলমানদের ধর্মীয় তামাদ্দুনিক এবং রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে আরও বেশী আইন-কানুন ও হেদায়েত দান করা হয়েছে। এসব বিধানের মধ্যে হজ্বের সফরের নিয়ম-কানুন ঠিক করা হয়েছে। আল্লাহ্র নির্দেশের প্রতি সম্মান করা ও কাবা ঘর জিয়ারত কারীদের প্রতি বাধা সৃষ্টি না করার নির্দেশ দেয়া হয়। খানা-পিনার জিনিসের হালাল-হারামের সুনির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। আহলে কিতাবদের (ইহুদী ও খৃষ্টান) সাথে খাওয়া-দাওয়া ও তাদের মেয়েদের বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়েছে এবং আল্লাহ্র নামে কসম ভঙ্গের কাফ্ফারা নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

দুই. নতুন ক্ষমতার অধিকারী মুসলমানদেরকে ক্ষমতার অপব্যবহার না করে সুবিচার ও ইনসাফের উপর টিকে থাকার জন্যে উপদেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্র আনুগত্য এবং তাঁর আইন-কানুন মেনে চলার যে ওয়াদা তারা দিয়েছে তার উপর যেনো তারা মজবুত থাকে– ইয়াহুদী ও

www.icsbook.info

খৃষ্টানদের মতো ওয়াদা ভঙ্গ করে তাদের পরিণতির অনুরূপ যেনো না হয় তার তাগাদা দেয়া হয়েছে। নিজেদের যে কোনো কাজ কামের সিদ্ধান্ত নেবার সময় যেনো তারা আল-কুরআনকে অনুসরণ করে এবং মুনাফেকী বর্জন করে চলে তার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

তিন. মুসলমানদের করতলগত ইহুদীদের ভ্রান্ত নীতি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছে এবং তাদেরকে সত্যের পথ ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়েছে। হুদাইবিয়ার সন্ধির ফলে গোটা আরব এবং পার্শ্ববর্তী জাতি বা সম্প্রদায়ের কাছে ইসলামের দাওয়াত প্রচারের সুযোগ ঘটে। এই সুযোগে খৃষ্টানদেরকেও তাদের আকীদার ভুল-ত্রুটিগুলো জানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং শেষ নবীর প্রতি ঈমান আনার আহবান জানানো হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের বিষয়বস্তুঃ দারসের জন্যে তিলাওয়াতকৃত আয়াত তিনটিতে প্রকৃত মুমিনদের কতিপয় গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মুমিনদের পারস্পরিক ব্যবহার এবং কাফেরদের সাথে কেমন আচরণ করতে হবে তাও বলা হয়েছে। যেসব মুসলমানের সাথে বন্ধুত্ব রাখতে হবে তাদের কি কি বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলী থাকবে তাও উল্লেখ করা হয়েছে।

ব্যাখ্যাঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা, আপনাদের সামনে দারসের জন্যে প্রয়োজনীয় তথ্য দেবার পর এখন আয়াতগুলোর প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা পেশ করছিঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ

হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি নিজের দ্বীন থেকে ফিরে যায়, (তবে যাক না।) তাহলে অচিরেই আল্লাহ্ অন্য এক জাতি পয়দা করবেন।

আলোচ্য আয়াতের পূর্বে ৫১-৫৩ নম্বর আয়াতে মুমিনদেরকে ইহুদী এবং খৃষ্টানদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব গড়া থেকে নিষেধ করার যে কারণ ছিলো, তা হলোঃ মদীনার ইহুদী ও খৃষ্টানেরা রাসূল (সাঃ) এর সাথে

www.icsbook.info

চুক্তিবদ্ধ ছিলো যে, তারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করবে না, বরং মুসলমানদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মদীনা হেফাজত করবে। কিন্তু **বানু কুরায়জার** ইহুদীরা তাদের চুক্তি ভঙ্গ করে মক্কার কাফেরদেরকে গোপনে সাহায্য করতে থাকে। তারা এক দিকে কাফেরদের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে, অপরদিকে মুসলমানদের অনেকের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক রেখে গুপ্তচরের ভূমিকায় লিপ্ত থাকে। আল্লাহ্ পাক আয়াত নাযিল করে মুসলমানদেরকে ইহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে সকল বন্ধুত্ব ছিন্ন করতে নির্দেশ দেন, যাতে তারা মুসলমানদের বিশেষ সংবাদ সংগ্রহ করতে না পারে। এ নির্দেশ মতো খাঁটি মুসলমানেরা প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। কিন্তু মুনাফেকরা এবং দুর্বলচেতা মুসলমানেরা ভবিষ্যতে কি হয়; যদি ইহুদী-খৃষ্টানদের চক্রান্ত সফল হয়ে যায়, তবে তো আমরা প্রাণে রক্ষা পাবনা, এ ভয়ে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলো না। কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহ্ তাআলা মক্কা বিজয়ের পূর্বেই মুনাফেকদের আসল চেহারা উন্মোচন করে তাদেরকে লাঞ্ছিত করেন।

অত্র আয়াতে মুসলমানদের বৃহত্তর স্বার্থেই তাদেরকে ইহুদী, খৃষ্টানদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব ও মেলামেশা করতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু যদি এটা কেউ না করে, তবে সত্য দ্বীন ইসলামের হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ্ স্বয়ং নিজেই গ্রহণ করবেন। কোনো ব্যক্তি কিংবা দলের বক্রতা ও অবাধ্যতা দূরের কথা, স্বয়ং মুসলমানদের কোনো ব্যক্তি কিংবা দল যদি সত্য সত্যই দ্বীন ইসলাম ত্যাগ করে বসে এবং সম্পূর্ণ ধর্মত্যাগী হয়ে কুফরীর সাথে হাত মেলায়, তবে এতেও দ্বীন ইসলামের কোনই ক্ষতি হবে না। তার কারণ হলো, এর হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ্র নিজের। তিনি তৎক্ষণাৎ অন্য কোনো জাতি বা সম্প্রদায়কে দ্বীনের হেফাজতের দায়িত্বে নিয়োজিত করবেন।

আল্লাহ্ তাবারাক ওয়া তাআলার কাজ কোনো ব্যক্তি, দল অথবা প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল নয়। দ্বীন ইসলাম থেকে যদি কেউ বের হয়ে

www.icsbook.info

যায়, তবে এতে সে ব্যক্তি বা দলই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আল্লাহ্ এবং তাঁর দ্বীনের এক চুল পরিমাণও ক্ষতি হবে না। লাভ-লস মানুষের।

ধর্ম ত্যাগীদের পরিবর্তে তাঁর দ্বীন ইসলাম হেফাজতের জন্যে যে জাতিকে তিনি কাজে নিয়োজিত করবেন, তাদের কতিপয় বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

প্রথম গুণঃ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ **যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসবে।** অর্থাৎ দ্বীনের হেফাজতকারী নতুন দলের লোকদের প্রথম গুণ হবে, আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তারাও আল্লাহ্‌কে ভালোবাসবে। এ গুণের দু'টি অংশঃ

প্রথম অংশঃ আল্লাহ্‌র সাথে তাদের ভালোবাসা এটা মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। কারণ কারো সাথে কারো ভালোবাসা স্বভাবগত ভালোবাসা না হলেও কমপক্ষে যৌক্তিক ভালোবাসাকে ইচ্ছাধীন রাখা যায়। তাছাড়া স্বভাবগত ভালোবাসা যদিও ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়, কিন্তু এর উপায় উপকরণগুলো ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। যেমনঃ আল্লাহ্‌র মাহাত্ম, প্রতাপ-প্রতিপত্তি, শক্তি-সামর্থ এবং মানুষের প্রতি তাঁর অসীম ক্ষমতা ও অফুরন্ত নেয়ামত এবং অনুগ্রহের কথা চিন্তা করলে স্বাভাবিক ভাবেই মানুষের মনে আল্লাহর ভালোবাসা পয়দা হয়ে যায়।

দ্বিতীয় অংশঃ অপর পক্ষে তাদের সাথে আল্লাহর ভালোবাসার ক্ষেত্রে মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের কোনো ভূমিকা নেই। এ বিষয়টি মানুষের ইচ্ছা ও সামর্থের বাইরে। তবে কুরআনের অন্যান্য আয়াতের পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, এ ভালোবাসার উপায় উপকরণগুলো মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। মানুষ যদি এসব উপায়কে কাজে লাগায় তবে তাদের সাথে আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা অবশ্যম্ভাবী। এসব উপায় নিচের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

হে রাসূল! আপনি তাদেরকে বলে দিন: তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে

www.icsbook.info

ভালোবাসতে চাও, তবে আমার আনুগত্য করো। এর ফলে আল্লাহ্ও তোমাদেরকে ভালোবাসবেন।

এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ভালোবাসা পেতে চায়, তার উচিত হবে জীবনের সর্বক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সুন্নতের অনুসরণ করা এবং তার উপর অবিচল থাকা। এ কাজ করলে আল্লাহ্ তাআলাও তাকে ভালোবাসবেন বলে ওয়াদা দিয়েছেন। এ আয়াত থেকে আরও জানা যায় যে, যে দল সুন্নতের অনুসরণ করে শরীয়তের নির্দেশ পালন করতে কোনো ত্রুটি করে না এবং নিজেরা সুন্নত বিরোধী কোনো কাজ ও বিদআত প্রচার করে না। একমাত্র তারাই কুফর ও দ্বীন ত্যাগের মোকাবেলা করতে পারে।

দ্বিতীয় গুণঃ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ **তারা মুমিনদের প্রতি বিনয়-নম্র এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর-কঠিন। এই গুণেরও দু'টি অংশঃ**

প্রথম অংশ হলোঃ মুমিনদের প্রতি **নম্র ও বিনয়ী** হবার অর্থ হলো এই যে, ঈমানদার লোকদের সাথে ঝগড়া-বিবাদ করবে না। অস্ত্র এবং শক্তির বাহাদুরী দেখাবে না। নিজের মেধা, যোগ্যতা, ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি, অর্থ-সম্পদ ও দৈহিক বল কোনো একটি জিনিসকেও সে মুসলমানদেরকে দমন, নির্যাতন-নিষ্পেষণ এবং ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে ব্যয়-ব্যবহার করবে না। মুমিন মুসলমানরা সব সময়ই একে অপরের প্রতি বিনয়ী, দয়া-মায়া, সহানুভূতিশীল, ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু ব্যাক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। এ সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) মুমিনদেরকে একটি দেহের সাথে তুলনা করে বলেনঃ

تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِىْ تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ اِذَا اشْتَكٰى عُضْوٌ تَدَاعٰى لَهٗ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمّٰى

www.icsbook.info

তুমি মুমিনদেরকে তাদের পরস্পরের প্রতি দয়া, ভালোবাসা এবং সহানুভূতি দেখানোর ব্যাপারে একই দেহের মতো দেখবে। যখন দেহের কোনো একটি অঙ্গ (আঘাত পেয়ে) কষ্ট পায় তখন দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার কষ্টে সাড়া দিয়ে অনিদ্রা এবং জ্বরে আক্রান্ত হয়ে যায়। (বুখারী মুসলিম)।

দ্বিতীয় অংশ হলোঃ তারা হবে কাফেরদের প্রতি কঠোর কঠিন। দ্বিতীয় অংশে اَعِزَّةٍ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এটি عَزِيْزٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ হলো প্রবল, শক্তিশালী ও কঠোর। অর্থাৎ তারা আল্লাহ্ এবং তাঁর দ্বীনের দুষমনদের মোকাবেলায় কঠোর ও পরাক্রান্ত। দুষমনেরা তাদেরকে সহজে কাবু করতে পারে না। ঈমানদারদের ঈমানের মজবুতি, দ্বীনদারীর নিষ্ঠা, নিয়ম-নীতি পালনে দৃঢ়তা, চরিত্রের বলিষ্ঠ ভূমিকা এবং বুদ্ধিমত্তার কারণে ইসলামের দুষমনদের সামনে ইস্পাতের মতো কঠিন ও পাথরের ন্যায় দুর্ভেদ্য হয়ে দাঁড়ায়। কোনো অবস্থাতেই নিজের ন্যায় নীতি ও পথ হতে বিচ্যুত করতে পারে না। কাফেরেরা কখনো কোনো সময়ই দুর্বল ও 'নরম কচি ঘাস' বলে মনে করবে না। বরং তারা মুমিনদেরকে বাঘের মতো ভয় করবে। কাফেরদের সামনে দিয়ে যাবার সময় ঈমান এবং চারিত্রিক বলিষ্ঠতার কারণে তারা তাকে যমের মতো ভয় করবে।

এখন এই গুণের উভয় অংশ একত্রিত করলে সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, তারা হবে এমন এক জাতি, যাদের ভালোবাসা ও শত্রুতা নিজ স্বার্থের পরিবর্তে কেবল আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং দ্বীনের খাতিরে নিবেদিত হবে। এ কারণেই তাদের বন্দুকের নল আল্লাহ্ ও রাসূলের অনুগত বান্দাদের দিকে তাক করা থাকবে না, বরং তাঁর দুষমন ও অবাধ্যদের দিকে তাক করা থাকবে। 'সূরা ফাতাহ্'তে আল্লাহ্পাক এই মর্মে উল্লেখ করে বলেনঃ

اَشِدَّاۤءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاۤءُ بَيْنَهُمْ. **(মুমিনেরা) কাফেরদের উপর হবে খরগো হস্ত, আর নিজেরা একে অপরের প্রতি হবে রহম-দেল।**

তৃতীয় গুণঃ يُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ তারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে। অর্থাৎ তারা দ্বীনের প্রচার; প্রসার ও প্রতিষ্ঠার জন্যে জিহাদে জড়িত থাকে। এই বাক্যটির প্রকৃত তাৎপর্য হলো এই যে, কুফর ও দ্বীন ত্যাগের মোকাবেলা করার জন্যে শুধু কতকগুলো প্রচলিত এবাদত এবং নম্র-কঠোর হওয়াই যথেষ্ট নয়,বরং দ্বীন ইসলাম কায়েম করার উদ্দীপনা ও প্রচেষ্টাও থাকতে হবে। কেননা, প্রকৃত মুমিনের জিন্দেগী হবে জেহাদী জিন্দেগী। এ কারণে আল্লাহ্‌ পাক যেখানে মুমিনদের গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন সেখানেই সরাসরি হোক কিংবা ইশারা ইঙ্গিতে হোক জেহাদের কথা উল্লেখ করেছেন। কেননা, আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠা এবং সংরক্ষণের জন্য জেহাদ বা আন্দোলনের প্রয়োজন। আর এ'কাজটি আনজাম দেবে মুমিন -মুসলমানেরা।

চতুর্থ গুণঃ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَائِمٍ এবং তারা কোনো বিদ্রুপ বা উপহাসকারীর বিদ্রুপ বা উপহাসকে পরওয়া করে না। একজন মুসলমানের দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার যে উদ্দীপনা থাকার কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, সেই উদ্দীপনাকে পূর্ণতা দানকারী হলো এই চতুর্থ গুণটি। অর্থাৎ দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও সমুন্নত রাখার চেষ্টায় তারা কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে পরওয়া করে না। একটু চিন্তা করলে বোঝা যায়, যে কোনো আন্দোলন পরিচালনার পথে দু'টি বিষয় বাধা হয়ে থাকে। একটি হলো বিরোধী দল বা শক্তির বাধা এবং অপরটি হলো আপন লোকদের ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও তিরস্কার। দেখা যায় যারাই দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়ে আন্দোলনে অগ্রসর হয়, তারা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বিরোধী শক্তির কাছে নতি স্বীকার করে না। জেল-যুলুম, আহত-নিহত ইত্যাদি সব কিছুই অম্লানবদনে সহ্য করে নেয়। কিন্তু নিজের লোকদের ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও নিন্দাবাদের মুখে বড় বড় কর্মীদেরও পদস্খলন ঘটে যায়। সম্ভবতঃ এ কারণেই আল্লাহপাক এর গুরুত্ব ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশে বলেছেন যে, তারা কারও ঠাট্টা-বিদ্রুপ, ভর্ৎসনা ও তিরস্কারের পরওয়া না করে তাদের আন্দোলন-সংগ্রাম চালিয়ে যায়।

প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এই বাক্যটি সামনে রেখে বর্তমান বিশ্বে ইসলামের দুষমনদের ভূমিকার দিকে আমরা একটু লক্ষ্য করলে তাই দেখবো। ইসলাম এবং ইসলামী আন্দোলনকে 'টেররিজম' (সন্ত্রাসবাদ) ও আন্দোলনের কর্মীদেরকে 'টেরোরিষ্ট' (সন্ত্রাসী) বলে আখ্যায়িত করছে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মিডিয়ার মাধ্যমে গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিচ্ছে। মুসলমান নামধারী ইসলামের দুষমনেরা দ্বীন কায়েমের আন্দোলনের কর্মীদেরকে সন্ত্রাসী, ক্যাডার, মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক, প্রগতিবিরোধী বলে তিরস্কার ও ভর্ৎসনার মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলমান দেশ বাংলাদেশেও উপরোক্ত কটুক্তি ছাড়া আরও কতকগুলো শব্দ সংযোগ করে যারাই ইসলাম বা ইসলামী আন্দোলনের কথা বলে তাদেরকেই স্বাধীনতা বিরোধী, রাজাকার, আলবদর আখ্যায়িত করছে। তাদের এসব বলার আসল উদ্দেশ্য হলো, যাতে করে ইসলাম এবং ইসলামী আন্দোলনের উপর বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হয়ে ইসলামী আন্দোলন থেকে দূরে সরে যায় অথবা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। আর অন্যরা যাতে এই আন্দোলনে যোগ না দেয়। এটা নতুন কিছু নয়, যুগে যুগে নবী রাসূল ও তাঁর সংগী সাথীদেরকে এবং পরবর্তী কালেও একই ভাবে ঠাট্টা-বিদ্রুপ ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করা হয়েছে। এটা ইসলামী আন্দোলনের চিরাচরিত সুন্নত। যারাই দ্বীন ইসলাম কায়েমের আন্দোলন করবে তাদেরকেই বিভিন্নভাবে ঠাট্টা-বিদ্রুপ, তিরস্কার এবং ভর্ৎসনা করা হবে। ধর্ম নিরপেক্ষ নামধারী মুসলমানেরা কুফর শক্তির সহযোগীতা নিয়ে অথবা সহযোগীতা দিয়ে ইসলামী আন্দোলনকে বানচাল করার জন্য যুগে যুগে কেয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত তাদের এই ভূমিকা অব্যাহত রাখছে এবং রাখবে। সুতরাং ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের বৈশিষ্টই হবে, তারা কোনো তিরস্কার, ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনাকে পরওয়া না করে মজবুত কদমে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। ডানে বামে কে থাকলো আর কে থাকলো না সে দিকেও সে ভ্রুক্ষেপ করবে না। অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন ঃ

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ ۚ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

এটি আল্লাহর অনুগ্রহ বা দয়া তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ বিশাল প্রাচুর্যের মালিক, মহাজ্ঞানী।

অত্র আয়াতের শেষ অংশে বলা হয়েছে, এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য আল্লাহ পাকেরই অনুগ্রহ এবং দান। তিনিই যাকে ইচ্ছা এসব গুণে গুণান্বিত করেন। সৎ গুণ অর্জন এবং প্রতিটি উত্তম কাজ আঞ্জাম দেবার জন্যে আল্লাহর অনুগ্রহের প্রয়োজন। কোনো মানুষই আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া এককভাবে নিজের চেষ্টাদ্ধচরিত্রের মাধ্যমে এসব গুণ বা বৈশিষ্ট্য হাসিল করতে পারে না। তার কারণ হলো-মানুষের ক্ষমতা, এবং উপায়-উপাদান অত্যন্ত সীমিত। আর আল্লাহ হচ্ছেন বিশাল উপায়-উপাদান এবং প্রাচুর্যের মালিক। আর তিনি অশেষ জ্ঞানেরও অধিকারী।

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

প্রকৃত পক্ষে তোমাদের বন্ধু ও অভিভাবক তো কেবলমাত্র আল্লাহ, তাঁর, রাসূল এবং ঈমানদার লোকেরা।

সূরার ৫১ এবং ৫২ নম্বর আয়াতে মুসলমানদেরকে ইহুদী নাসারাদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেছেন। এখন এই আয়াতে মুসলমানদের গভীর ও বিশেষ বন্ধুত্ব কাদের সাথে হবে তা উল্লেখ করেছেন। তাদের প্রকৃত বন্ধু এবং অভিভাবক হবে সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলা অতঃপর তাঁর রাসূল (সাঃ)। কেননা, মুসলমানদের বন্ধু ও অভিভাবক সব সময় এবং সর্ব অবস্থায় আল্লাহ তাআলাই আছেন এবং তিনিই হতে পারেন। তাঁর সম্পর্ক ছাড়া যতো সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব আছে, সবই ক্ষণস্থায়ী এবং ধ্বংসশীল। আর রাসূল (সাঃ) এর সাথে সম্পর্ক ও বন্ধুত্বও প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ তাআলারই সাথে সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব, আলাদা কিছু নয়। তৃতীয় পর্যায়ে ঈমানদারদের সংগী-সাথী ও আন্তরিক বন্ধু ঐসব মুসলমান, যারা শুধু নামে নয়, সত্যিকার খাঁটি মুসলমান। সত্যিকার ও খাঁটি ইমানদার মুসলমানদের গুণ বা লক্ষণের কথা উল্লেখ করে

www.icsbook.info

আল্লাহ্ পাক নিম্নে পরপর তিনটি লক্ষণের কথা বর্ণনা করে বলেনঃ

প্রথম লক্ষণঃ اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ **তারা নামায কায়েম করে।** নামায কায়েম বলতে অধিকাংশ মুফাস্সিরীনগণ বলেনঃ নামাযের পূর্ণ হেফাজত। আর তা হলো, নামাযের বাইরের এবং ভেতরের প্রতিটি শর্ত ও হুকুম সঠিক ভাবে আদায় করা। অর্থাৎ যথাযথভাবে পবিত্রতা হাসিল করা। সময়মত আওয়াল ওয়াক্তে জামায়াতের সাথে নামায আদায় করা। বিনয়ী ও খুশু-খজুর সাথে নামায আদায় করা। সুন্নতি তরিকায় ধীরস্থিরভাবে রুকু, সেজদাহ্, কিয়াম এবং বৈঠক ইত্যাদি আদায় করা। নামাযের আদব রক্ষা করা। নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী নামায না পড়া। আর নামায কায়েমের বাস্তব দিক হলো-ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ভাবে নামায প্রতিষ্ঠা করা। সুতরাং খাঁটি ঈমানদারের প্রথম লক্ষণই হলো, নিজেও যেমন ব্যক্তিগতভাবে নামায কায়েম করবে, তেমনি রাষ্ট্রীয়ভাবেও নামায কায়েম বা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

দ্বিতীয় লক্ষণঃ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ **তারা যাকাত আদায় করে। খাঁটি** ঈমানদার মুসলমানদের দ্বিতীয় লক্ষণ হলো, তাদের অর্থ-সম্পদ থেকে শরীয়তের বিধি অনুযায়ী যাকাত আদায় করে। বছরান্তে সঠিকভাবে হিসাব-নিকাশ করে হিসাব মত নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ বের করে। কৃপণতা এবং খামখেয়ালীপনা করে না।

তৃতীয় লক্ষণঃ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ **এবং তারা আল্লাহ্‌র সামনে অত্যন্ত বিনয়ী** অর্থাৎ তাদের তৃতীয় লক্ষণ হলো, তারা নিজের সৎ এবং ভালো আমল বা কাজের জন্য গর্ব-অহংকার করে না। বরং তারা বিনয়ের সাথে আল্লাহ্‌র সামনে মাথা নতো করে দেয়।

তাফসীরে মাযহারীতে رَاكِعٌ শব্দের পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ করে নামাযের রুকুকে বুঝিয়েছেন। وَهُمْ رَاكِعُوْنَ বাক্যটি ব্যবহার করার উদ্দেশ্য হলো মুসলমানদের নামায অন্যান্য সম্প্রদায়ের নামায থেকে

www.icsbook.info

পৃথক করা। কেননা, ইহুদী এবং খৃষ্টানরাও নামায পড়ে, কিন্তু তাদের নামাযে রুকু নেই। রুকুসহ নামায একমাত্র মুসলমানদেরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

অতঃপর আল্লাহ্পাক কারা আল্লাহ্র দলের লোক তা উল্লেখ করে বলেনঃ

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ

আর যারা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং ঈমানদারকে বন্ধু বা অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে, তারাই আল্লাহ্র দল এবং তারাই হবে বিজয়ী।

কুরআনের নির্দেশ মতো যারা বিজাতির সাথে গভীর বন্ধুত্ব করা থেকে বিরত থেকে কেবলমাত্র আল্লাহ্ তাঁর রাসূল এবং খাঁটি মুসলমানদেরকে বন্ধু এবং অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে, তারাই হচ্ছে আল্লাহ্র দল। আর তারাই যুগ যুগ ধরে বিজয়ী হয়ে আসছে এবং হবে।

অতীতের ঘটনাবলী লক্ষ্য করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) সবার উপর জয়ী হয়েছেন। যে শক্তিই শীষা ঢালা এই প্রাচীরে আঘাত হেনেছে, সে শক্তিই ধাক্কা খেয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ) এর বিরুদ্ধে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠলে আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে সবার উপর বিজয়ী করেন। দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রাঃ) এর মোকাবেলায় তৎকালীন বিশ্বের শক্তিধর দু'টি দেশ কায়সার ও কেসরা (রোম ও পারস্য) এগিয়ে আসলে আল্লাহ্ তাআলা তাদের নাম-নিশানা পর্যন্ত মিটিয়ে দেন। তাঁদের পরবর্তী খলিফা এবং যেসব মুসলমান যতদিন আল্লাহ্র এসব নির্দেশ পালন করেছে এবং মুসলমানেরা বিজাতির সাথে মেলামেশা ও গভীর বন্ধুত্ব থেকে দূরে থেকেছে, ততোদিন তাদেরকেই বিজয়ী বেশে দেখা গেছে। আর যখনই মুসলমানেরা আল্লাহ্র সেই নির্দেশ

www.icsbook.info

বে-মালুম ভুলে গিয়ে বিজাতির সাথে বন্ধুত্বের হাত মিলিয়েছে, তখনই তারা চরমভাবে মার খেয়েছে। সুতরাং মুসলমানদের সব সময়ের জন্যই বিজাতি অমুসলিমদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে এবং আল্লাহ্‌র এই নির্দেশকে সব সময় মনে রাখতে হবে।

শিক্ষাঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! সূরা মায়েদার তিনটি আয়াতের দারস থেকে যেসব শিক্ষা আমরা লাভ করলাম তা হলোঃ

❑ দ্বীন ইসলামে টিকে থাকার জন্য সার্বক্ষণিক আল্লাহ্‌র নির্দেশ মতো চলতে হবে। নিজের পছন্দ-অপছন্দের ধার ধারা যাবে না। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দ্বীন ইসলামের উপর টিকে থাকার জন্য আল্লাহ্ তাআলার রহমত এবং সাহায্য কামনা করতে হবে।

❑ আল্লাহ্‌র ভালোবাসা লাভের জন্যে আল্লাহ্‌কেই ভালোবাসতে হবে। তাঁর ভালোবাসা পেতে হলে রাসূল (সাঃ) এর আনুগত্য করতে হবে।

❑ এক মুসলমান আর এক মুসলমানের প্রতি দয়া-মায়া এবং সহানুভূতি দেখাবে। নম্র-ভদ্র আচরণ করবে, যুলুম করবে না।

❑ খোদাদ্রোহী শক্তির ব্যাপারে কঠোর মনোভাব রাখতে হবে। তাদের সাথে দ্বীনের ব্যাপারে কোনো আপোশ করা যাবে না। এমন ঈমান এবং চরিত্র সৃষ্টি করতে হবে, যাতে করে ঈমানী এবং চারিত্রিক বলিষ্ঠতা দেখে বাতিল শক্তির অন্তরে ভীতি সৃষ্টি হয়ে যায় এবং ষড়যন্ত্র করার কোনো সাহস না পায়।

❑ আল-কুরআনের শাসন কায়েমের আন্দোলনে জড়িত থাকার ফলে মুস-লমান নামধারী ধর্মনীরপেক্ষবাদীদের কাছ থেকে যে ধরণের ঠাট্টা-বিদ্রুপ, তিরস্কার এবং ভর্ৎসনা করা হোক না কেনো, এসব কিছুর পরওয়া না করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। আন্দোলন থেকে নিস্ক্রীয় বা ছিটকে পড়া যাবে না। আমাদের দেশে যারাই ইসলামী আন্দোলন করে

www.icsbook.info

তাদেরকেই সাম্প্রদায়ীক, মৌলবাদী, রাজাকার, আলবদর বলে ঠাট্টা বিদ্রুপ এবং তিরস্কার করে। এসব বলার মূল উদ্দেশ্যই হলো আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া। এটি একটি শয়তানি হাতিয়ার। এজন্য মন খারাপ করা বা ঘাবড়ানো যাবে না। এটা ইসলামী আন্দোলনের চিরাচরিত মনস্তাত্মিক বাধা মনে করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

❑ সদাসর্বদা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং যারা নামাযী, যাকাত আদায়কারী, নীরহংকারী, আল্লাহ্র শোকরিয়া আদায়কারী ঈমানদার মুসলমানদেরকে আন্তরিক বন্ধু এবং অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

❑ আল্লাহ্র দলভুক্ত হবার জন্যে আল্লাহ্ তাঁর রাসূল এবং মুমিনদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। আর আল্লাহ্র দলভুক্ত হতে পারলেই বাতিল শক্তির উপর বিজয়ী হওয়া যাবে।

আহবানঃ প্রিয় ভাঁয়েরা/বোনেরা! আপনাদের সামনে এতক্ষণ পর্যন্ত সূরা মায়েদা থেকে যে দারস পেশ করলাম, এতে যদি আমার অজান্তে কোনা ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যায়, তার জন্য আল্লাহ্র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর এই দারস থেকে যেসব শিক্ষা আমরা লাভ করলাম, তা যেনো বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারি সেই তৌফিক কামনা করে দারস শেষ করছি। আল্লাহ্ আমাদের সকলের নেক আমলগুলো কবুল করুন। আমিন।

অয়া আখেরু দাওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

www.icsbook.info

আল্লাহ্‌র কতিপয় কুদরাত ও নেয়ামত

সূরা-আল্‌-নাবা-১-১৬-আয়াত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عَمَّ يَتَسَاۤءَلُوْنَ- عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ- الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ- كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ- ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ-اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا-وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا- وَّخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا- وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا- وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا- وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا- وَّبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا- وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا- وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَاۤءً ثَجَّاجًا- لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا- وَّجَنّٰتٍ اَلْفَافًا

সরল অনুবাদঃ ইরশাদ হচ্ছে-(১) তারা একে অপরে কোন্ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে ? (২) সেই মহা খবর(কেয়ামত) সম্পর্কে, (৩) যে বিষয়ে তারা বিভিন্ন উক্তি করে ? (৪) কক্ষনও নয়, অতি শীঘ্রই তারা জানতে পারবে। (৫) হ্যাঁ কক্ষন-ই নয়, অতি শীঘ্রই তারা জানতে পারবে। (৬) এটা কি সত্য নয় যে, আমিই যমীনকে বিছানা স্বরূপ বানিয়েছি (৭) এবং পাহাড় পবর্তকে পেরেকের মতো গেড়ে দিয়েছি ? (৮) আমি তোমাদেরকে (নারী-পুরুষে) জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছি।

www.icsbook.info

(৯) তোমাদের জন্যে ঘুমকে করেছি ক্লান্তি দূরকারী। (১০) আর রাতকে আবরণ (১১) এবং দিনকে জীবিকা অর্জনের সময় বানিয়ে দিয়েছি। (১২) আর তোমাদের মাথার উপর মজবুত সাতটি আকাশ নির্মাণ করেছি (১৩) এবং একটি অতি উজ্জ্বল প্রদীপ (সূর্য) সৃষ্টি করেছি। (১৪) আমি মেঘমালা থেকে প্রচুর বৃষ্টিবর্ষন করি, (১৫) যাতে তার দ্বারা শস্য, শাক-সবজি (১৬) ও ঘন পাতা বিশিষ্ট বাগ-বাগিচা উৎপাদন করতে পারি।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থঃ عَمَّ-কি সম্পর্কে? يَتَسَاءَلُوْنَ-তারা (পরস্পরে) জিজ্ঞাসাবাদ করে। عَنْ-সম্পর্কে। اَلنَّبَاءِ-খবর বা সংবাদ। اَلْعَظِيْمِ-বড়। اَلَّذِىْ-যে,তা। هُمْ-তারা। فِيْهِ -উহা (কেয়ামত) সম্পর্কে। مُخْتَلِفُوْنَ -(নিজেরাই) মতানৈক্যকারী। كَلَّا কক্ষনও নয়। سَيَعْلَمُوْنَ -শীঘ্র তারা জানতে পারবে। ثُمَّ -আবার (বলি)। اَلَمْ نَجْعَلْ-আমি কি করিনি। اَلْاَرْضَ-পৃথিবী বা ভূমি। مِهَدًا-বিছানা। وَ-এবং اَلْجِبَالَ-পাহাড়-পর্বত সমূহ। اَوْتَادًا -পেরেক। وَخَلَقْنَاكُمْ -আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি। اَزْوَاجًا -জোড়া জোড়া (নারী-পুরুষ)। وَجَعَلْنَا -আমি করেছি। نَوْمَكُمْ -তোমাদের নিদ্রা বা ঘুম। سُبَاتًا-ক্লান্ত দুর করা, আরাম বিশ্রাম.করা। اَلَّيْلَ-রাত। لِبَاسًا -পোষাক, আবরণ। اَلنَّهَارَ -দিন সমূহ। مَعَاشًا-(জীবিকা অর্জনের) সময়। بَنَيْنَا-আমি নির্মাণ করেছি। فَوْقَكُمْ-তোমাদের (মাথার) উপর। سَبْعًا-সপ্ত বা সাত। شِدَادًا-মজবুত (আকাশ)। سِرَاجًا-প্রদীপ (সূর্য)। وَهَّاجًا -অতি উজ্জ্বল। وَاَنْزَلْنَا-আমি বর্ষন করি।

مِنَ–থেকে বা হতে। مُعْصِرٰتِ-জলে পরিপূর্ণ মেঘমালা। مَاءً ثَجَّاجًا-প্রচুর বৃষ্টি বা অবিরাম বৃষ্টি। لِنُخْرِجَ-যাতে উৎপন্ন করি। بِهٖ -তার দ্বারা। حَبًّا-শস্য। وَّنَبَاتًا-শাক-সব্জি বা তরিতরকারি বা উদ্ভিদ। وَجَنّٰتٍ اَلْفَافًا ঘন পাতা বিশিষ্ট বাগান বা সুনিবিড় বাগ-বাগিচা।

সম্বোধনঃ সম্মানিত ইসলাম প্রিয় দ্বীনদার/ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ভায়েরা/বোনেরা! আস্‌সালামু আলাইকুম অরাহমাতুল্লাহি অবারাকাতুহ্। আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কালামে হাকীম এর তিরিশ পারা অর্থাৎ আমপারার প্রথম সূরা আন্‌নাবা এর ১-১৬ নম্বর আয়াত পর্যন্ত তিলাওয়াত এবং সরল অনুবাদ/তরজমা পেশ করেছি। আল্লাহ্ পাক যেনো আমাকে শেষ পর্যন্ত সঠিক ভাবে দারস পেশ করার তাওফীক দান করেন। **ওমা তাওফীকি ইল্লাবিল্লাহ্**

সূরাটির নামকরণঃ অত্র সূরার ২য় আয়াত عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ–এর اَلنَّبَاِ শব্দটিকে এই সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। نَبَاٍ শব্দের অর্থ সংবাদ বা খবর। অর্থাৎ কেয়ামত ও পরকালের মহা খবরকে বোঝানো হয়েছে। অন্যান্য সূরার মতো এই সূরার নামকরণ কেবলমাত্র পরিচিতি বা চেনার জন্যই নয় বরং এই সূরার আলোচ্য বিষয়ের শিরোনামও বটে। কেননা এই সূরার সমস্ত আলোচনাই কেয়ামত ও পরকাল সম্পর্কিত।

সূরাটি নাযিল হবার সময়কালঃ সূরা **কেয়ামাহ্** থেকে সূরা **নাযিয়াত** পর্যন্ত সব কয়টি সূরার বিষয়বস্তু প্রায় একই রকমের। আর এই সব কয়টি সূরা-ই রাসূলে করীম (সাঃ) এর মক্কী জীবনের প্রথম দিকে নাযিল হয়েছে বলে মনে হয়। সুতরাং এই সূরাটিও নবুয়াত লাভের প্রথম দিকের 'মাক্কী সূরা'।

সূরাটির মূল বিষয়বস্তুঃ আলোচ্য সূরাটির মূল বিষয়বস্তু হলো কেয়ামত ও পরকালের প্রমাণ এবং তা মানা না মানার পরিণতি সম্পর্কে লোকদেরকে অবহিত করা।

শানে নূযুলঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, আল-কুরআন নাযিল শুরু হলে মক্কার কাফেরেরা তাদের বৈঠকে বসে এ বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করতো যে, কুরআনে কেয়ামত অর্থাৎ আখেরাতের আলোচনাকে খুব বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। অথচ এটা তাদের মতে একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। তাই এ সম্পর্কে খুব বেশী বেশী আলোচনা-পর্যালোচনা চলতো। কেউ কেউ একে সত্য মনে করতো আবার কেউ কেউ একে অস্বীকার করতো। তাই আল্লাহ্ পাক কাফেরদের কেয়ামত ও পরকাল সম্পর্কে মতানৈক্য, অবিশ্বাস, খট্‌কা ও আপত্তির জবাব দিয়ে আলোচ্য আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন।

ব্যাখ্যাঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! আপনাদের সামনে সূরা **নাবা** সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা প্রদানের পর এখন আমি তেলাওয়াত ও অনুবাদকৃত আয়াতগুলোর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা পেশ করছি।

عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ–**তারা কি বিষয়ে পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করছে?** অত্র আয়াতে কোন্ জিনিস সম্পর্কে তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসা করছে এবং কোন্ বিষয়ে তারা কথা-বার্তা বলছে? এর পরের আয়াতেই তার জবাব দেয়া হয়েছে। অবশ্য সূরার শুরুতেই তাদের থেকে জবাব পাবার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করা হয়েছে এমন নয়, বরং তাদের (কাফেরদের) অবস্থার উপর বিষ্ময় প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের বৈচিত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে, যাতে করে ওদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের মধ্য দিয়ে বাস্তব বিষয়টি প্রকাশ পেয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ্ নিজেই উত্তর দিয়ে বলেনঃ

عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ **সেই মহা সংবাদ (কেয়ামত) সম্পর্কে।**

نَبَاءِ الْعَظِيْمِ শব্দের অর্থ বড় সংবাদ বা মহা খবর। এখানে

www.icsbook.info

মহাখবর বলে কেয়ামত ও পরকালকে বোঝানো হয়েছে। মাক্কী যুগের সূরা এবং আয়াতের বিষয়বস্তু ছিলো মূলতঃ তাওহীদ রেসালাত এবং আখেরাত সম্পর্কে। মহানবী (সাঃ) এই তিনটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে দাওয়াতী কাজ শুরু করেছিলেন। মক্কাবাসীদের জন্য প্রথম দুটি বিষয়ে আপত্তি থাকলেও শেষের বিষয়টির ব্যাপারে তাদের ঘোর আপত্তি ছিলো। কেয়ামত এবং আখেরাতের বিষয়টি তারা কোনো যুক্তিতেই মেনে নিতে পারতো না। বরং তারা প্রতিটি মজলিশে ও সভা সমিতিতে এ সম্পর্কে নানা রকম উক্তি ও মন্তব্য করতো। তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতো - তাই মানুষ মরে যাবার পরও কি আবার জিন্দা হবে এটা কি কখনও হতে পারে? মানুষের হাড় মাংস পচে গলে যাবার পর তাতে আবার প্রাণের সঞ্চার হবে এমন কথা কি কোনো ভাবেই বিশ্বাস করা যায় ? আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সব মানুষ আবার একত্রিত হবে একথা কি বোধগম্য হবার মতো? চন্দ্র-সূর্য পাহাড়-পর্বত আকাশ সবকিছু চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে এরকমের বক্তব্য কি করে সম্ভব হতে পারে? আবার নাকি জান্নাত-জাহান্নামও আছে ? মোট কথা মক্কার কোরাইশ কাফেরেরা কেয়ামত এবং আখেরাতের কোনো বিষয়কে একেবারেই মেনে নিতে পারছিলো না। বরং তারা এ বিষয় নিয়ে হাঁসি-ঠাট্টা এবং বিদ্রুপ পর্যন্ত করতো। তাই আল্লাহ্ পাক অত্র সূরাটি জিজ্ঞাসার সূর দিয়েই আরম্ভ করেছেন এবং সাথে সাথে তাদের জিজ্ঞাসাবাদের বিষয় কেয়ামতের কথাটি সরাসরি উল্লেখ না করে মহা বা বড় খবর বলে তাদেরকে হতচকিত করে তুলেছেন। অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ যে বিষয়ে তারা মতানৈক্য করতো। এই আয়াতের দু'টি অর্থ হতে পারে- প্রথম অর্থ হতে পারে, তারা এ বিষয়ে অর্থাৎ কেয়ামতের বিষয়ে বিভিন্ন রকমের কথা-বার্তা এবং উক্তি করছে। দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে, বিশ্বজগতের পরিণতি সম্পর্কে তারা নিজেরাও একমত হতে পারে না। বিভিন্ন জন বিভিন্ন মন্তব্য করে থাকে।

মক্কার বেঈমান কুরাইশদের মধ্যে কেয়ামত এবং পরকাল সম্পর্কে

www.icsbook.info

কয়েকটি মতামত ছিলো, যেমনঃ

এক. এই শ্রেণীর লোকেরা মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হতে হবে এটা বিশ্বাস করতো। কিন্তু তারা এই জীবনকে দৈহিক জীবন হবে না, হবে আত্মীক বা আধ্যাত্মিক জীবন বলে মনে করতো। তারা পরকালকে একেবারেই অবিশ্বাস করতো না, কিন্তু সেটা সম্ভব কি না এই নিয়ে তাদের মনে প্রবল সন্দেহ- সংশয় ছিলো। তাদের এই ধারণাকে সূরা জাসিয়ার ৩২ নম্বর আয়াতে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছেঃ

إِنْ نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَّمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ–

আমরা (পরকালের) বিষয়ে কেবল ধারণা রাখি, তবে এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই।

দুই. আর এক শ্রেণীর লোক ছিলো, যারা দুনিয়ার জীবন ছাড়া পরকালের জীবনকে মোটেই বিশ্বাস করতো না। সূরা-'আনআম'-এর ২৯ নম্বর আয়াতে তাদের বক্তব্য তুলে ধরে বলেন ঃ

إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ–

এই দুনিয়ার জীবনটাই একমাত্র জীবন। আমাদেরকে পুনরায় জীবিত হতে হবে না।

তিন. এদের মধ্যে কিছু লোক ছিলো প্রকৃতিবাদী। যারা আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করতো না। তাদের বক্তব্য আল্লাহ্ পাক 'সূরা-জাসিয়ার' ২৪ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করেন।

مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ–

আমাদের দুনিয়ার জীবনটাইতো শেষ জীবন। এখানেই আমাদের জীবন, এখানেই আমাদের মরণ। কালের আবর্তন ছাড়া কোনো কিছুই (শক্তি) আমাদেরকে ধ্বংস করতে পারবে না।

www.icsbook.info

চার. আবার এমন কিছু লোকও ছিলো, যারা কালবাদী ছিলো না বটে, তবে পরকালের জীবনকে তারা অসম্ভব মনে করতো। তাদের মত ছিলো মরে যাওয়া লোকদেরকে আবার জিন্দা করা আল্লাহ্‌র ক্ষমতার বাইরে! তিনি একাজ করতে সক্ষম নন। আল্লাহ্‌পাক তাদের মন্তব্য সূরা 'ইয়াসীন' এর-৭৮ নম্বর আয়াতে এভাবে উল্লেখ করেনঃ

مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ–

পচা-গলা অস্থিমজ্জাকে পুনরায় জীবিত করবে এমন কে আছে ?

কাফের বেঈমানদের কেয়ামত এবং পরকাল সম্পর্কে উপরোক্ত মতামত দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, তাদের এই বিষয়ে কোনো স্থির জ্ঞান ছিলো না। তারা কেবল ধারণা এবং অনুমানের ভিত্তিতে মন্তব্য করতো। তাদের যদি এ বিষয়ে স্পষ্ট জ্ঞান থাকতো, তা হলে তারা একই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হতো। পরকাল সম্পর্কে তাদের এই মতানৈক্য এবং উক্তির প্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌পাক এবার অত্যন্ত তাগিদের সাথে দু'দুবার প্রতিউত্তর দিয়ে বলেনঃ

كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ– ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ **কক্ষনও নয়। আবার বলছি (শোন,) কক্ষন-ই নয়।** অর্থাৎ কিয়ামত ও আখেরাত সম্পর্কে তারা যতই সওয়াল জওয়াব আলোচনা পর্যালোচনা, তর্ক-বিতর্ক, মতানৈক্য অথবা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করুক না কেনো, তাদের সবকিছুই ভুল ও ভিত্তিহীন। আখেরাতের ব্যাপারে তারা যা কিছু মনে করে তা আদৌ সত্য নয়। তাদের এই অসারতা অতিসত্তর তাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে। তখনই তারা জানতে ও বোঝতে পারবে,রাসূল (সাঃ) আখেরাত সম্পর্কে আগাম যে খবর দিয়েছিলেন, তাই সত্য ও সঠিক ছিলো। আর নিছক ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে তারা যা কিছু বলতো বা উক্তি করতো, তার পেছনে আদৌ কোনো সত্যতা নেই। অতি সত্ত্বর অর্থাৎ মৃত্যুর পর পরজগতের সবকিছু তাদের সামনে ভেসে উঠবে এবং সেখানকার ভয়াবহ দৃশ্য তারা স্বচক্ষে দেখতে পাবে।

প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! কেয়ামত ও পরকাল সম্পর্কে তৎকালীন মক্কার কাফের লোকদের যেসব ধারণা ছিলো- সকল যুগে অনুরূপ লোকদের সন্ধান পাওয়া যায়। বর্তমান যুগেও অমুসলমান তো দূরে থাক, মুসলমান নামধারী কমিউনিষ্ট নাস্তিকরাও অনুরূপ ধারণা পোষণ এবং মন্তব্য করে থাকে। সুতরাং পৈত্রিক সূত্রে নামধারী মুসলমান হলেও তারা বেঈমান কাফের। আল্লাহ্ এবং রাসূলের চরম দুষমন। অতএব তাদের ব্যাপারে ঈমানদার মুসলমানদের সতর্ক থাকা উচিত।

অতঃপর আল্লাহ্পাক কেয়ামতের বিষয়টি সাময়িক ভাবে এড়িয়ে গিয়ে তাঁর অপারশক্তি, কুদরাত, হেকমাত ও কারিগরীর কর্মকৌশলের কয়েকটি দৃশ্য তুলে ধরেছেন। যা মানব জাতির জন্য অপরিসীম বৈষয়িক নেয়ামত।

প্রথম কুদরাত ও নেয়ামত ঃ اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا। **আমি কি যমীনকে তোমাদের জন্য বিছানা স্বরূপ বানাইনি ?** অত্র আয়াতে মানব জাতির জন্য বৈষয়িক প্রথম নেয়ামতের কথা স্মরণ করে দিয়ে মহান আল্লাহ্ বলেনঃ আমি তো তোমাদের জন্য যমীন বা ভূমিকে বিছানার মতো শান্তিতে বসবাসের উপযুক্ত করে তেরী করেছি।

'মেহাদ' (বিছানা) বলতে ভ্রমণ ও চলাফেরার জন্য সমভূমি, আবার দোলনার মতো নরম বিছানা- এ দু'টি অর্থই বোঝায় এবং এখানে এ দু'টি অর্থের মধ্যে চমৎকার মিল রয়েছে। আল্লাহ্পাক সাধারণ মানুষদের বোঝানোর জন্য একেবারে অতি পরিচিত শব্দ ব্যবহার করে মানুষকে তার সৃষ্টির কুদরাত ও কর্মকুশলতার কথা তুলে ধরেছেন। যমীনকে মানুষের জন্য বিছানা অর্থাৎ শান্তিতে বসবাসের কুদরাত ও কর্মকুশলতার যে প্রকৃত রূপ নিহিত রয়েছে তা হলোঃ

১. মানুষের জন্য শান্তিতে এবং নিরাপদে বসবাসের জন্য যমীনকে বিছানো স্বরূপ বানানো হয়েছে। যেখানে পানি, আলো, বাতাস এবং তাপের সমন্বয় করা হয়েছে। জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যমীনেই করা হয়েছে।

২. জীব-জন্তুকে নিরাপদে এবং শান্তিতে বসবাসের জন্য ভূমিকে তৈরী করা হয়েছে। প্রাণী জগতের জীবন যাপন এবং চলাফেরার জন্য যা যা দরকার তা আল্লাহ্ পাক যমীনেই পয়দা করেছেন।

৩. উদ্ভিদ জগতের লালন পালনের জন্য যমীনকে পয়দা করা হয়েছে। উদ্ভিদ জগতের লালন-পালনের জন্য পানি, বাতাস, তাপ ও আলো অনুপাত এবং সহযোগীতাকে কার্যকর করা হয়েছে।

এই যমীনের উপর জীব-জন্তুর লক্ষ লক্ষ প্রজাতি এবং উদ্ভিদেরও লক্ষ লক্ষ প্রজাতি রয়েছে। আবার প্রতিটি প্রজাতির কোটি কোটি ব্যক্তি সত্ত্বাও রয়েছে। প্রত্যেকটির খাদ্য খাবারের প্রয়োজন বিভিন্ন ধরনের ও পরিমাণের। আল্লাহ্ পাক দুনিয়ার এই যমীনে প্রত্যেকটি প্রজাতির খাদ্য-খাবার এত বেশী পরিমাণ এবং এত কাছাকাছি ও আওতাধীন করে সৃষ্টি করে দিয়েছেন যে,এখানে কোনো প্রজাতিই তাদের প্রয়োজনীয়এবং জরুরী খাদ্য-খাবার হতে মাহরুম হয় না। যদি তাপ, আলো, বাতাস, পানি এবং পৃথিবীর বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে যথাযতভাবে সামঞ্জস্য ও সহযোগীতা না থাকতো, তা হলে এক কণাও খাদ্য-খাবারের অস্তিত্ব লাভ করতে পারতো না। ফলে কোনো মানুষ, জীব-জন্তু এবং গাছ-পালা বাঁচতে পারতো না। সুতরাং আল্লাহ্ পাক যমীনকে মানুষ সহ অন্যান্য জীব-জন্তু এবং গাছ-পালার জন্য নিরাপদ এবং শান্তিতে বসবাস ও লালন পালনের এক বিশেষ ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

দ্বিতীয় কুদরাত ও নেয়ামতঃ অতঃপর আল্লাহ্ পাক তার দ্বিতীয় কুদরাত এবং মানুষের জন্য নেয়ামতের কথা তুলে ধরে বলেনঃ

وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا **পাহাড়-পর্বতকে পেরেকের মতো গেড়ে দিয়েছি।**

অত্র আয়াতে পাহাড়-পর্বতকে পেরেকের সাথে তুলনা করা হয়েছে। সূরা নহলের ১৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্পাক পাহাড়কে নংগরের সাথে তুলনা করে বলেনঃ

وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ

তিনি যমীনে পর্বতের নংগর সমূহ গভীরভাবে গেড়ে দিয়েছেন, যাতে যমীন তোমাদেরকে নিয়ে হেলো-দোলা করতে না পারে।

সূরা মুরসালাতের ২৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্পাক বলেনঃ

وَّجَعَلْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ شٰمِخٰتٍ

আমি তাতে (যমীনে) উঁচু উঁচু পর্বতমালা মজবুত ভাবে গেড়ে দিয়েছি। আল্লাহ্ পাকের যমীনের উপর এবং সমূদ্রের তলে অসংখ্য পাহাড়-পর্বত সৃষ্টির পেছনে অসংখ্য ফায়দার মধ্যে মৌলিক দুটি ফায়দা নিহিত রয়েছে।

প্রথম ফায়দা হলোঃ পানির উপর ভাসমান এই যমীন যাতে টলমল করে ভারসাম্য হারিয়ে না দেয়। পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা করার জন্যই আল্লাহ্ পাক পাহাড় পর্বতগুলোকে পেরেকের মতো যমীনের উপর গেড়ে দিয়েছেন। এই পাহাড়-পর্বত সমুদ্রের পানির নীচে এবং যমীনের উপর স্থাপিত। এর কারণ হলো এর দ্বারা পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগের এবং উপরিভাগের সংকোচনকে নিয়ন্ত্রণ করা।

দ্বিতীয় ফায়দা হলোঃ এই যমীনের বুককে শুধু শূন্য সমতল মাঠ বানিয়ে রাখা হয়নি। এখানে স্থানে স্থানে ছোট বড় অসংখ্য পাহাড়-পর্বত উঁচু উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর এর পেছনে ফায়দা হলোঃ মৌসুমের পরিবর্তন, বৃষ্টি বর্ষণ, ঝর্ণা, খাল-নদী সৃষ্টি, ফল-ফসল উৎপাদনের জন্য উর্বর জমি সৃষ্টি, বড় বড় গাছপালা সৃষ্টি, নানা ধরনের খনিজ সম্পদ এবং নানা প্রকার পাথর সংগ্রহ ইত্যাদি কাজে পাহাড়-পর্বতই অবদান রাখে।

তৃতীয় কুদরাত ও নেয়ামতঃ وَّخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا–**আমি তোমাদেরকে জোড়া জোড়া (নারী-পুরুষ) করে সৃষ্টি করেছি।**

অত্র আয়াতে মানুষের বিশেষ নেয়ামত তার অস্তিত্বের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। মানুষকে .নারী-পুরুষ হিসেবে জোড়া জোড়া সৃষ্টির পেছনে আল্লাহ্ পাকের যে মহান উদ্দেশ্য ও সৃষ্টি কৌশল লুক্কায়িত আছে

তা হলো ঃ

এক. মানব বংশ বৃদ্ধি। আল্লাহ্পাক যদি আদম (আঃ)-কে সৃষ্টির পর বিবি হাওয়াকে সৃষ্টি না করতেন তাহলে হয়তো আজ পৃথিবীর বুকে আদম (আঃ) ছাড়া আর কেউ থাকতো না। পৃথিবী আবাদ হতো না। আল্লাহ্পাকের অসংখ্য নেয়ামতের ভোগ-ব্যবহারের সুযোগ হতো না। মানুষ সৃষ্টির পেছনে আল্লাহ্ পাকের যে মহান উদ্দেশ্য-তাঁর বন্দেগী এবং দুনিয়ায় খেলাফতের দায়িত্ব পালন করা তা ব্যর্থ হয়ে যেতো।

দুই. জোড়া জোড়া সৃষ্টির দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ্ পাক পুরুষ এবং নারীর মধ্যে পৃথক পৃথক যেসব আবেগ, প্রেম, ভালবাসা, দয়া-মায়া, সহানুভূতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তা প্রয়োগের সুযোগ থাকতো না। সবকিছু নিস্প্রাণ ও নির্জীব হয়ে যেতো।

জানার বিষয় হলোঃ আয়াতে জুড়ি বা জোড়া বলতে কেবলমাত্র মানব জাতির স্ত্রী-পুরুষকেই বোঝায় না। বরং সকল প্রকার জীব-জন্তু ও উদ্ভিদ জগতের স্ত্রী-পুরুষ বোঝায়। এছাড়া আরো অনেক জিনিস এমন আছে যাকে আল্লাহ্পাক স্ত্রী-পুরুষের মত করে বানিয়েছেন। এদের একে অপরের সংমিশ্রণ ও মিলনের ফলেই নতুন নতুন জিনিসের উদ্ভব হয়। যেমন উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বিদ্যুতেও স্ত্রী-পুরুষ রয়েছে যাকে নেগেটিভ-পজেটিভ বলা হয়। এরা পরস্পরে জোড়া। এদের পরস্পরের সংমিশ্রণের ফলে গোটা দুনিয়ায় বিস্ময়কর সৃষ্টি ধারা অব্যাহত রয়েছে। এভাবে আল্লাহ্পাক তাঁর সৃষ্টি জুড়ি বানিয়ে গোটা দুনিয়াকে চলমান, উদ্ভাসিত এবং কার্যকর করে দিয়েছেন।

চতুর্থ কুদরাত ও নেয়ামতঃ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا

আমি তোমাদের ঘুমকে ক্লান্তি দুরকারী শান্তির বাহন বানিয়ে দিয়েছি।

سُبَاتًا শব্দটি سَبْتٌ– থেকে উদ্ভব হয়েছে। এর অর্থ কমানো, কর্তন করা। ঘুম মানুষের চিন্তা-ভাবনাকে কর্তন করে বা কমিয়ে তার অন্তর ও মস্তিষ্ককে এমন স্বস্তি ও শান্তি দান করে, যার বিকল্প দুনিয়ার কোনো শান্তি

হতে পারে না।

মানুষ দুনিয়ায় দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাকে যেমন দৈহিক পরিশ্রম করতে হয়, তেমনি তাকে অমানসিক চিন্তাও করতে হয়। আল্লাহ্পাক যদি ঘুমের মাধ্যমে এ দু'টি জিনিস থেকে অবসাদ গ্রহণের সুযোগ করে না দিতেন, তাহলে এক সময় মানুষ দৈহিক শক্তি হারিয়ে ফেলতো এবং মানসিক চাপে মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটতো। ঘুম মানুষের জন্য এমন এক বড় নেয়ামত যে, মানুষ যখন জীবন যুদ্ধে এবং সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে শারিরীক এবং মানসিক ভাবে ক্লান্ত-শ্রান্ত,ভীত সন্ত্রস্ত এবং চরম চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়ে, তখন ঘুম তাকে এমনভাবে প্রশান্তি দেয় যে, ঘুমের পূর্বে কি ঘটেছিলো তা সে সহজে মনে করতে পারে না। ঘুমের মাধ্যমে মানুষ যেমন দৈহিক শক্তি ফিরিয়ে পায়, তেমনি মানসিক প্রশান্তিও লাভ করে নতুন উদ্দোমে দায়িত্ব পালনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। যেমন ভাবে বদর ও উহুদ যুদ্ধে আল্লাহ্ তাআলা সাহাবায়ে কেরামকে ঘুমের দ্বারা মানসিক অস্থিরতা দুর করে দিয়েছিলেন।

পঞ্চম কুদরাত ও নেয়ামতঃ وَجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا- **আর রাতকে করেছি আবরণ।** অর্থাৎ আমি রাতকে করেছি পোষাকের মতো আবরণ। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, স্বাভাবিকভাবে মানুষের ঘুম তখনই আসে, যখন আলোর ঝলকানি না থাকে। চারদিক নীরব থাকে এবং হট্টগোল না থাকে। আল্লাহ্ তাআলা রাতকে আবরণ বলে এ কথাই বোঝাতে চান যে, তিনি তোমাদেরকে কেবল ঘুমই দেননি; বরং সারা দুনিয়ায় ঘুমের পরিবেশও তৈরী করে দিয়েছেন। যা মানুষের জন্যে এক বিশেষ নেয়ামত।

ষষ্ঠ কুদরাত ও নেয়ামতঃ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا **দিনকে করেছি আয়-রোজগারের সময়।**

মানুষের সুখ ও শান্তির জন্য প্রয়োজনীয় রুজি তালাশ করা অত্যন্ত জরুরী। যদি সারাক্ষণ রাতই থাকতো এবং মানুষ কেবল ঘুমই পড়তো

তা হলে এসব আয় রোজগার কিভাবে হতো ? তাই আল্লাহ্পাক আলো উজ্জ্বল দিন সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষকে জীবিকা অর্জনের সুযোগ করে দিয়েছেন। এভাবে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর সৃষ্টির ভারসাম্য রক্ষা করেছেন এবং এ বিশ্ব জগতকে বসবাসের উপযোগী করে দিয়েছেন। এটাও মানুষের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মস্ত বড় নেয়ামত।

সপ্তম কুদরাত ও নেয়ামতঃ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا আমি **তোমাদের মাথার উপর সাতটি মজবুত আকাশ তৈরী করেছি।** পৃথিবীবাসীর মাথার উপর সাতটি মজবুত জিনিস বলতে, আল্লাহ্ তাআলা থরে থরে সাজানো সাতটি আকাশকে বুঝিয়েছেন। কুরআনের অন্য যায়গায় সাতটি কক্ষপথ বলা হয়েছে। এসব সৃষ্টির পেছনে কোন্ মহান উদ্দেশ্য ও কৌশল নিহিত রয়েছে একমাত্র তা আল্লাহ্ পাকই জানেন। এটা মানুষের বোধগম্য নয়। তবে মানুষ গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন মত প্রকাশ করে থাকে। যা কেবল অনুমান ভিত্তিক।

شِدَادًا সুদৃঢ় বা মজবুত শব্দ দ্বারা এই ইঙ্গিত দেয় যে, এ সাতটি জিনিসের গঠন-প্রকৃতি অত্যন্ত মজবুত। তাদের কাঠামো খুব শক্ত এবং একটি অপরটির সাথে এমনভাবে আবদ্ধ যে, কোনোটিকে কোনোটি থেকে পৃথক করা যায় না।

আধুনিক বিজ্ঞানীরা আকাশ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন যে, আকাশ বলতে এমন শক্ত কোনো বস্তু নয়। মানুষ যখন মাথার উপর শূণ্যের দিকে তাকায় তখন তার দৃষ্টি সীমার বাইরে চলে যাবার কারণে নীল দেখায়। এখানে স্তরে স্তরে সাজানো ছাদের মতো সাতটি আকাশ বলে কিছু নেই। কিন্তু কোরআন এবং হাদীসে আকাশকে ছাদের মতো শক্ত বস্তু বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন মহানবী (সাঃ)-এর মে'রাজের ঘটনায় উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, মহানবী (সাঃ) বায়তুলমাকদেশ থেকে উর্দ্ধাকাশে (মেরাজ) সিঁড়ি জাতীয় জিনিস দিয়ে উঠতে থাকলেন এবং প্রথম আসমানে গেলেন। সেখানে দরজায়

মোতায়েন ফেরেশতারা তাঁকে সালাম এবং শুভেচ্ছা জানালেন। এভাবে সাতটি আকাশ একইভাবে অতিক্রম করলেন। আর সাতটি আকাশে সাতজন বিশিষ্ট নবীর সাথেও স্বাক্ষাৎ করলেন। এই হাদীস থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, সাতটি আসমানই শক্ত বস্তুর মতো মজবুত জিনিস যার দরজা আছে।

অষ্টম কুদরাত ও নেয়ামতঃ অতঃপর আকাশের সাথে সম্পৃক্ত কয়েকটি উপকরণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যা মানুষের জন্য অত্যন্ত উপকারী এবং সুখের। তার মধ্যে সব চেয়ে বড় উপকারী উপকরণ হচ্ছে সূর্যের আলো। তাই বলা হয়েছেঃ وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا

আমি একটি অতি উজ্জ্বল প্রদীপ (সূর্য) সৃষ্টি করেছি।

وَّهَّاجًا শব্দের অর্থ (একসাথে) অত্যন্ত উত্তপ্ত ও অতি উজ্জ্বল। অনুবাদে এ দু'টি দিককে শামিল করা হয়েছে। এর মধ্যে আল্লাহ্ তাআলার অসীম কুদরাত এবং সৃষ্টি কৌশলের এক বিরাট নিদর্শনের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই সূর্যের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের চেয়ে ১০৯ গুণ এবং আয়তনে ৩ লক্ষ ৩৩ হাজার গুণ বড়। তার তাপমাত্রা ১ কোটি ৪০ লক্ষ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেট। তার অবস্থান পৃথিবী থেকে ৯ কোটি ৩০লক্ষ মাইল দূরে হওয়া সত্ত্বেও তার আলো এতই তেজস্বী যে, খালি চোখে একনিষ্ঠভাবে তাকিয়ে থাকলে অবশ্যই চোখ ঝলসে যাবে এবং দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে যাবে। তার তাপ এতই প্রচন্ড যে, পৃথিবীর কোনো কোনো অংশে তাপমাত্রা ১৪০ ডিগ্রী ফারেনহাইট পর্যন্ত পৌঁছিয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ্র কি অসীম মেহেরবাণী যে, তিনি তার সৃষ্টি কৌশলের মাধ্যমে পৃথিবীকে সূর্য থেকে একটা বিশেষ দূরত্বে স্থাপন করেছেন। খুব কাছে নয় বলে পৃথিবী বেশী উত্তপ্ত হয় না এবং খুব বেশী দূরেও নয় বলে পৃথিবী একেবারে ঠান্ডাও হয়ে যায় না। আর এ কারণেই এখানে মানুষ, জীবজন্তু এবং গাছপালার জীবন সম্ভব হয়েছে। যদি সূর্যের আলো প্রয়োজনের তুলনায়

বেশী অথবা কম হতো তা হলে মানুষ, জীব-জন্তু এবং গাছ-পালা কিছুই বাঁচতে পারতো না। মানুষ সহ সকল সৃষ্টি জীবনের জন্য এ এক বড় নেয়ামত। এই সূর্যের কারণে আমাদের ফসল পাকে। আল্লাহ্‌র সৃষ্টি জীব তার কারণেই খাবার পাচ্ছে। তার তাপেই সমুদ্রের পানি উত্তপ্ত হয়। তার ফলেই তা থেকে যে বাষ্প তৈরী হয়, তাই মেঘের আকারে বাতাসের সাহায্যে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে এবং বৃষ্টি বর্ষিত হয়। এই সূর্যে আল্লাহ্ পাক এমন এক বিরাট-বিশাল অগ্নিকুন্ড জ্বালিয়ে রেখেছেন, যা কোটি বছর থেকে আলো, তাপ ও বিভিন্ন প্রকারের রশ্মি গোটা সৌরজগতে প্রতিনিয়ত নিক্ষেপ করে যাচ্ছে। আল্লাহ্‌র এই অফুরন্ত নেয়ামতের শোকরিয়া আদায় করে শেষ করা যাবে না।

নবম কুদরাত ও নেয়ামতঃ মানষের অত্যন্ত উপকারী এবং সুখের জিনিস আকাশের নীচে সৃষ্ট জিনিসের মধ্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস মেঘমালার কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্‌পাক বলেনঃ

وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاۤءً ثَجَّاجًا

আমি জলধর মেঘমালা থেকে প্রচুর বৃষ্টিপাত করি। পূর্বের আয়াতে যে উজ্জ্বল সূর্যের কথা বলা হয়েছে। তারই প্রভাবে মহাসাগরে বাষ্প তৈরী হয়ে আকাশে মেঘের সৃষ্টি করে ও বৃষ্টি আকারে নেমে আসে।

অত্র আয়াতে পানি ভরা মেঘ থেকে প্রচুর পানিবর্ষণ করার কথা বলা হয়েছে। মেঘ ঘনীভুত হয়ে যখন ভারী হয়ে যায়, তখনই পানি আকারে মশুল ধারে বৃষ্টি হয়।

দশম কুদরাত ও নেয়ামতঃ অতঃপর আল্লাহ্‌পাক মেঘ থেকে বৃষ্টিপাতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেনঃ لِنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا - وَجَنّٰتٍ اَلْفَافًا

যাতে করে তা থেকে উৎপন্ন করি (নানা রকমের) ফল-ফসল, শাক-সব্জি এবং ঘন পাতা বিশিস্ট বাগান।

আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মানুষেরই কল্যাণ এবং সুখের জন্য ধারাবাহীক ভাবে যেসব কুদরাত এবং নেয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তারই সূত্র ধরে সর্বশেষ নেয়ামত হলো, সূর্যের তাপ থেকে সমুদ্রে বাষ্প হয়, সেই বাষ্প আকাশে গিয়ে মেঘের সৃষ্টি করে। সেই মেঘমালা যখন জলীয় পাম্পের আধিক্যের কারণে ভারি হয়ে যায়, তখনই যমীনে মশুলধারে বৃষ্টি হয়। আর সেই বৃষ্টি থেকেই মানুষের জীবন ধারণ এবং আরাম আয়েশের জন্য নানা রকমের ফল-ফসল, শাক-সব্জি, তরি-তরকারী এবং আনন্দদায়ক বাগ-বাগিচা উৎপাদিত হয়।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আল্লাহ্‌পাক তাঁর সৃষ্টির কুদরাত এবং কৌশলের কথাগুলো মানুষের সামনে এই জন্যই উপস্থাপন করলেন, যাতে করে তারা কেয়ামত এবং পরকাল সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক, বাক-বিতন্ডা, ঠাট্টা-বিদ্রুপ এবং সংশয়-সন্ধেয় না করে। তারা যেনো মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের প্রতি সকল অনুগ্রহ এবং নেয়ামতের কথা স্মরণ করে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন দান করে হেসাব-নেকাশের মাধ্যমে তাদের স্থায়ী ঠিকানা জান্নাত অথবা জাহান্নামে যেতে হবে, তার উপর ঈমান বা প্রত্যয় সৃষ্টি হয়।

শিক্ষাঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! সূরা 'নাবা' এর ১-১৬ নম্বর আয়াত পর্যন্ত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমাদের জন্য যে, সব শিক্ষা রয়েছে তা হলো, দুনিয়ার এই ক্ষণস্থায়ী জীবনকে কিয়ামতের মাধ্যমে ধ্বংস করে পুনরায় আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সকল মানুষকে জীবন দান করে হাশরের ময়দানে আল্লাহ্‌র সামনে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে সেই বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস এবং প্রত্যয় রাখতে হবে। সে ক্ষেত্রে তর্ক-বিতর্ক তো দূরের কথা নূন্যতম সন্দেহ-সংশয় এমনকি মনের খটকাও যেনো আমাদের দেলে সৃষ্টি

www.icsbook.info

না হয়। বরং সে ব্যাপারে দৃঢ় ঈমান রাখা এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মানুষেরই কল্যাণ, আরাম-আয়েশ, উপকার ও প্রয়োজনে যেসব নেয়ামতের কথা বর্ণনা করা হয়েছে তার শোকরানা স্বরূপ একমাত্র তারই সামনে মস্তক অবনত করে একমাত্র তারই বন্দেগী করা।

আহ্বানঃ সম্মানিত ভায়েরা/ বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা **নাবা** থেকে যে দারস পেশ করলাম তাতে যদি আমার অজান্তে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে যায় তার জন্য আল্লাহ্ পাকের দরবারেই ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর এই দারস থেকে যে শিক্ষা আমারা লাভ করলাম, তা যেনো বাস্তব জীবনে আমল করতে পারি সেই তৌফিক কামনা করে শেষ করছি।

আট

মুনাফিকদের আচরণ

সূরা বাকারা ৮-১৬ আয়াত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِا للّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا
هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ- يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَمَا
يَخْدَعُوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ- فِىْ قُلُوْبِهِمْ
مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ بِمَا كَانُوْا
يَكْذِبُوْنَ- وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ قَالُوْٓا
اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ-اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا
يَشْعُرُوْنَ-وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَا اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْٓا
اَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ
لَّا يَعْلَمُوْنَ-وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَاِذَا
خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ- قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ
مُسْتَهْزِءُوْنَ- اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِى
طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ-اُوْلٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِا

لْهُدٰى فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ–

সরল অনুবাদঃ ইরশাদ হচ্ছে–(৮) মানুষের মাঝে এমন কিছু লোক আছে যারা (মুখে) বলে, আমরা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরা ঈমানদার নয়। (৯) এরা (মুখে মুখে ঈমানের দাবী করে) আল্লাহ্ ও ঈমানদারদেরকে ধোঁকা দিতে চায়। অথচ তারা নিজেরা নিজেদেরকেই ধোঁকা দেয়, কিন্তু তারা তা অনুভব করতে পারে না। (১০) আসল কথা হলো এদের মনের মধ্যে আছে এক ধরনের মারাত্মক রোগ। (ক্রমাগতভাবে এই প্রতারণার পথে চলার কারণে) আল্লাহ্ তাদের এই (মনের) রোগকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর তাদের এই মিথ্যাচারিতার জন্য ভয়াবহ আযাব অপেক্ষা করছে। (১১) তাদের যখন বলা হয়, দুনিয়াতে তোমরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না, তখন তারা (প্রতিউত্তরে) বলে, আমরাই তো সংশোধনকারী। (১২) অথচ এরাই আল্লাহ্র এই যমীনে ফেৎনা-ফাসাদ সৃষ্টিকারী, কিন্তু তাদের এ ব্যাপারে কোনো চেতনা নেই। (১৩) আর তাদেরকে যখন বলা হয়, অন্যান্য লোকেরা (অর্থাৎ সাহাবীরা) যেভাবে ঈমান এনেছে তোমরাও সেভাবে ঈমান আনো। তখন তারা বলে, (তুমি কি চাও যে,) আমরাও সে সব বোকা লোকদের মতো ঈমান আনি ? (সত্যি কথা হচ্ছে) এরা নিজেরাই বোকা, কিন্তু তারা তা অনুভব করে না। (১৪) (এ ধরনের মুনাফিক লোকদের চরিত্র এই যে) এরা যখন ঈমানদার লোকদের সাথে মিশে তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আবার যখন তারা নিরিবিলি নিজেদের শয়তানী চক্র (ইহুদী নেতাদের) সাথে মিলিত হয়, তখন বলে, আমরা তো তোমাদের সাথেই আছি, আমরা কেবল (মুসলমানদের সাথে) ঠাট্টা-বিদ্রুপ করছিলাম মাত্র। (১৫) আসলে আল্লাহ্ই তাদের সাথে উপহাস করেন। আর তিনি তাদের বিদ্রোহের রশিকে লম্বা করে দিয়েছেন, যেনো তারা অন্ধের মতো গোমরাহীর মধ্যে হাবুডুবু খায়। (১৬) এরা (জেনে-শুনে) হেদায়েতের বিনিময়ে গোমরাহীর পথকে খরিদ করে নিয়েছে।

www.icsbook.info

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থঃ وَ–এবং। مِنْ–হতে। اَلنَّاسِ–মানবমন্ডলী। -

مَنْ–যে, যারা। يَقُوْلُ–তারা বলে। اٰمَنَّا–আমরা ঈমান এনেছি।

بِ–প্রতি। اَلْيَوْمَ–দিবস। اَلْاٰخِرْ–শেষ, পরকাল مَا–নহে। هُمْ-তারা।

بِمُؤْمِنِيْنَ–বিশ্বাসী। يُخٰدِعُوْنَ–তারা ধোকা দেয়। اَلَّذِيْنَ –যারা।

اٰمَنُوْا–ঈমান এনেছে। مَا–না। اَنْفُسَهُمْ–তাদের জীবনসমূহ।

يَشْعُرُوْنَ-তারা বোঝে। فِى-মধ্যে। قُلُوْبُهِمْ-তাদের অন্তরসমূহ।

مَرَضٌ-ব্যাধি, রোগ।-فَزَادَهُمْ অতঃপর বৃদ্ধি করে দিয়েছে।। لَهُمْ-

তাদের জন্য। عَذَابٌ-শাস্তি। اَلِيْمٌ-যন্ত্রণাদায়ক। بِمَا-কারণ। كَانُوْا-

তারা হলো। يَكْذِبُوْنَ-মিথ্যাবাদী। اِذَا-যখন। قِيْلَ-বলা হয়।

لَاتُفْسِدُوْا- তোমরা অশান্তি/বিশৃংখলা সৃষ্টি করো না। اَلْاَرْضِ-

পৃথিবীতে। قَالُوْا-তারা বলে। اِنَّمَا -নিশ্চয় আমরা। مُصْلِحُوْنَ-

সংশোধনকারী বা শান্তি স্থাপনকারী। اَلَّا-সাবধান বা জেনে রাখো।

انهم-নিশ্চয় তারা । وَلٰكِن-এবং কিন্তু। لَايَشْعُرُوْنَ-তারা বোঝে

না। اٰمَنُوْا–ঈমান আনো। كَمَا–যেমন, যেরূপ। اَ-কি। انؤمن

–আমরা ঈমান আনবো। اَلسُّفَهَاءُ–নির্বোধ বা বোকাদের। لَا

يَعْلَمُوْنَ– তারা জানে না। لَقُوْا–তারা মিলিত হয়। خَلَوْا- নির্জন বা

নিরিবিলি اِلٰى–দিকে, সংগে। شَيٰطِيْنِهِم–তাদের শয়তানী নেতৃবৃন্দ।

اِنَّا–নিশ্চয় আমরা। مَعَكُمْ–তোমাদের সংগে। مُسْتَهْزِءُوْنَ -

উপহাসকারী বা বিদ্রুপকারী। اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ-আল্লাহ তাদের সাথে উপহাস করেন। وَيَمُدُّهُمْ-এবং তাদেরকে অবকাশ বা ঢিল দিচ্ছে। طُغْيَانِهِمْ-তাদের অবাধ্যতা। يَعْمَهُوْنَ-তারা উদভ্রান্ত হয়ে বেড়ায়। اُوْلٰئِكَ-ওরা-ই। اِشْتَرَوُا-খরিদ করেছে। اَلضَّلٰلَةَ-গোমরাহী, ভ্রষ্টতা। بِالْهُدٰى- হেদায়েতের পরিবর্তে বা বদলে। مَارَبِحَتْ- লাভজনক হয়নি। تِجَارَتُهُمْ- তাদের ব্যবসা। وَمَاكَانُوا مُهْتَدِيْنَ-এবং তারা হেদায়েত লাভ করেনি।

সম্বোধনঃ দারসে কুরআন মাহফিলে/ প্রোগ্রামে উপস্থিত প্রিয়/সম্মানিত দ্বীনদার ভায়েরা/বোনেরা / ভাই ও বোনেরা! আস্‌সালামু আলাইকুম অয়া রাহ্‌মাতুল্লাহি অয়া বারাকাতুহ্। আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কালামে হাকীম আল-কুরআনের সবচেয়ে বড় সূরা সূরাতুল বাকারার ৮ থেকে ১৬ মোট ৯টি আয়াত তিলাওয়াত ও সরল অনুবাদ পেশ করেছি। আল্লাহ্ তাআলা যেনো আমাকে আপনাদের সামনে সঠিকভাবে দারস পেশ করার তৌফিক দান করেন। **অমা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ্।**

সূরার নাম করণঃ এ সূরাটির নাম **সূরাতুল বাকারা**। "বাকারাতুন" শব্দের অর্থ গাভী বা গরু। এ সূরার ৮ম রুকুর ৬৭-৭১ নম্বর আয়াত পর্যন্ত বনী-ইসরাঈলদের প্রতি গরু কুরবাণীর নির্দেশ দিতে গিয়ে "বাকারা" শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এই সূরার নাম **সূরাতুল বাকারা** রাখা হয়েছে। বাকারা নাম করণের ফলে এটা মনে করা যাবে না যে, এতে শুধু গরু সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে। কুরআনের প্রায় প্রতিটি সূরাতেই এতো বেশী বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যে, বিষয়বস্তুর দিক থেকে কোনো সূরার নামকরণ শিরোনাম হিসেবে নির্ধারণ করা খুব কঠিন ব্যাপার। এজন্য নবী করীম (সাঃ) আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশ মতো শিরোনামের পরিবর্তে সূরার মধ্য থেকে কোনো একটি শব্দকে বেছে নিয়ে

সূরার পরিচিতি হিসেবে নামকরণ করেছেন। সুতরাং **বাকারা** নামটি এই সূরার পরিচিতি হিসেবে নেয়া হয়েছে।

সূরাটি নাযিল হবার সময়কালঃ এই সূরার অধিকাংশ আয়াতই হিজরতের পর মাদানী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়। অবশ্য এর কিছু আয়াত মাদানী জীবনের প্রায় শেষের দিকে যেমন সূদ হারাম সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হয়। কিন্তু বিষয়বস্তুর সাথে মিল থাকার কারণে এ সূরার সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। আবার এই সূরার শেষের আয়াতগুলো হিজরতের আগে মক্কায় নাযিল হয়েছিলো। কিন্তু বিষয়বস্তুর সাথে মিল থাকার কারণে এই সূরার সাথে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। তবে সবকিছুই করা হয়েছে ওহীর মাধ্যমে। এই সুরার অধিকাংশ আয়াত হিজরতের পরে মদীনায় নাযিল হয়েছে বিধায় এ সূরাকে মাদানী সূরা বলা হয়। এটা কুরআন শরীফের সবচেয়ে বড় সূরা। এতে ৪০টি রুকু ও ২৮৬টি আয়াত রয়েছে।

সূরার বিষয়বস্তুঃ এই দীর্ঘতম সূরায় ইসলামের অধিকাংশ মূল নীতিগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। এতে নামায, রোজা, যাকাত, হজ্ব, বিবাহ-তালাক, হালাল-হারাম, ব্যবসা-বাণিজ্য, জিহাদ, যুদ্ধনীতি এবং বিভিন্ন বিষয়ের নীতি-নিয়ম বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। মুত্তাকীনদের বৈশিষ্ট্য, মুনাফিকদের আচরণ, কাফিরদের পরিনতি, আদম ও হাওয়া (আঃ)-এর সৃষ্টির ইতিহাস, বনী ইসরাঈলদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ এবং তাদের নাফারমানীর কথাও বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশ এবং সবশেষে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ কামনার জন্য আল্লাহ্ পাক তাঁর বান্দাদের এক হৃদয়গ্রাহী মুনাজাত শিখিয়ে দিয়েছেন।

আলোচ্য আয়াতগুলোর বিষয়বস্তুঃ তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোতে কপট বিশ্বাসী মুনাফিকদের আচরণ বা বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করে তাদের প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

পটভূমিঃ মাক্কী সূরাগুলোতে আল্লাহ্ তাআলা সাধারণতঃ মক্কার কাফের ও মুসলমানদেরকে সম্বোধন করেই বিভিন্ন আয়াত ও সূরা নাযিল করেন।

www.icsbook.info

তার কারণ, মক্কাতে এ দু'টি দলই ছিলো। মুসলমানেরা মুহাম্মদ (সাঃ) কে আল্লাহ্‌র রাসুল এবং কুরআনকে আল্লাহ্‌র কালাম হিসেবে মানতো এবং কাফেররা রাসূলের বিরোধীতা করতো ও কুরআনকে আল্লাহ্‌র কালাম বলে স্বীকার করতো না। এজন্য এই দু'দলের উপলক্ষ্যেই কুরআনের আয়াত নাযিল হতো। কিন্তু মদীনায় হিজরতের পর আরো দু'টি দল **ইহুদী ও মুনাফিক** এদের মোকাবেলা করতে হলো। ইহুদীরা আহলে কিতাব (কিতাব ধারী) হবার কারণে তারা নবী, রাসূল, বেহেশত, দোযখ, কেয়ামত, আখেরাত ও আসমানী কিতাব–ইত্যাদি সম্পর্কে জানতো এবং সেগুলো বিশ্বাস করতো। অতীতের আসমানী কিতাব, তাওরাত, যাবুর এবং ইঞ্জিলে রাসূলের পরিচয় ও তাঁর উপর নাযিল করা কুরআন আল্লাহ্ তাআলার নিজস্ব কালাম হবার সত্যতা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইহুদীরা খালি খালি হিংসা এবং অহংকারের বশবর্তী হয়ে তার সত্যতা সম্পর্কে জানা-শোনার পরও রাসূলের বিরোধিতা করতো। আর মুনাফিকরা ইসলামী রাষ্ট্রের আর্থিক সুযোগ-সুবিধা এবং নেতৃত্বের লোভে মুখে মুখে নিজেকে মুসলমান হিসেবে জাহির করলেও অন্তরে কুফরী রেখে আল্লাহ্‌র রাসূল ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সব সময় শত্রুতা করতো। এমনকি তারা এতো মারাত্মক ছিলো যে, কিভাবে মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর দলকে ধ্বংস করা যায় তার ষড়যন্ত্রে সদাসর্বদা ব্যস্ত থাকতো এবং সুযোগ পেলেই কাজে লাগাতো। এ জাতীয় লোকদের মধ্যে অন্যতম ছিলো আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুল। মদীনায় রাসূলের আগমনের পূর্বে তার গোত্রের লোকেরা তাকে রাজা বানিয়ে বরণ করে নেয়ার জন্য মালা তৈরী করে রেখেছিলো।

সূরা বাকারার শুরুতেই মুমিন মুত্তাকীনদের গুনাবলী, কাফেরদের অবস্থান ও পরিণতি এবং মুনাফিকদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সূরার ২য় রুকুতে অর্থাৎ যা দারসের জন্য পেশ করা হয়েছে সেখানে মুনাফিকদের পরিচয় স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

ব্যাখ্যাঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত সূরা বাকারা এবং আলোচ্য আয়াতগুলো সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেয়ার পর এখন আমি আপনাদের

www.icsbook.info

সামনে তেলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা পেশ করছিঃ

আল্লাহ্ পাক মানব জাতিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন প্রথম শ্রেণীভুক্ত হলো-মুমিন মুত্তাকী লোক। তাদের পরিচয় অত্র সূরার ২ থেকে ৫ নম্বর আয়াতে তুলে ধরেছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হলো-কাফের-গোষ্ঠী। অত্র সূরার ৬ এবং ৭ নম্বর আয়াতে তাদের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। আর তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হলো-মুনাফিকদের দল। তাদের পরিচিতি ৮ থেকে ১৬ নম্বর আয়াতে বিস্তারিত ভাবে বিবরণ দেয়া হয়েছে। যা আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করা হয়েছে। আর তা হলোঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ–

মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা (মুখে) বলে আমরা আল্লাহ্ এবং পরকালে ঈমান এনছি। (আল্লাহ্ বলেন) অথচ তারা আদৌ ঈমান আনেনি। আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওবাই ইবনে সলুল এর নেতৃত্বে যে মুনাফিক দলটি মদিনার ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করতো, দলের এই লোকেরা প্রকাশ্যে কাফেরদের দলভুক্ত না হলেও মনের দিক থেকে তারা ছিলো কাফের। মুসলমানদের দলভুক্ত থেকে পার্থিব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার জন্যই নিজেদেরকে ঈমানদার বলে দাবী করতো। কিন্তু আসলে তারা তারা তা ছিলো না। আল্লাহ্ আ'লেমুল গায়েব বিধায় তাদের মনের খবর রাখতেন। তাই আল্লাহ্ তাদের এই দাবীকে প্রত্যাখ্যান করে দিয়ে বলেন, এরা মোটেই ঈমানদার নয়, বরং এরা কপট মোনাফিক। আল্লাহ্ তাদের এই মোনাফীকি আচরণ তুলে ধরে বলেনঃ

يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ–

তারা (এ মিথ্যা দাবী দ্বারা) আল্লাহ্ এবং ঈমানদারদেরকে ধোঁকা দিতে চায়। অথচ এতে তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে ধোঁকা

দেয় না। কিন্তু তারা তা বোঝতে পারে না।

যারা প্রকাশ্যে তাদের কুফরী চেহারা প্রকাশ করতে হিম্মত রাখে না, তারাই আবার নিজেদেরকে খুবই চতুর, চালাক ও ধুরন্ধর মনে করে এবং সহজ সরল মুমিন মুসলমানদেরকে ধোকা দিতে সক্ষম বলে আত্মতৃপ্তি লাভ করে। আসলে তারা মুমিনদেরকে নয়, বরং আল্লাহ্কেই ধোকা দেয় বা দেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের এটা বোঝার বোধশক্তি নেই। মুনাফিকদের এই চালবাজির কারণে তারা নিজেরাই দুনিয়াতেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং পরকালেও ক্ষতির সম্মুখীন হবে। দুনিয়াতে একজন মুনাফিক হয়তো কিছুদিনের জন্য লোকদেরকে প্রতারিত করে রাখতে পারে। কিন্তু তা কখনও স্থায়ী হতে পারে না। একদিন না একদিন তাদের প্রতারণার জাল ছিন্ন হয়ে আসল চেহারা জাতির সামনে প্রকাশ পেয়ে যাবে। তখন তাদের সামাজিক সম্মান-মর্যাদা বলতে আর কিছুই থাকবে না। কেউ তাদের বিশ্বাস করতে পারবে না। আর পরকালের তো কোন কথাই নেই। কারণ সেখানে ঈমানদারীর মৌখিক দাবীর কোনো মূল্যই দেয়া হবে না।

তারা আল্লাহ্ এবং মুমিনদেরকে ধোকা দেয় এই উক্তির মধ্যে আমরা একটা সত্য বিষয়ের সন্ধান পাই। আর তা হলো-আল্লাহ্ ও মুমিনদের মাঝে ঘনিষ্ট সম্পর্ক। এই সম্পর্কের কারণে তিনি মুমিনদের পরিস্থিতিকে নিজের পরিস্থিতি হিসেবে অবিহিত করেন। তিনি তাদেরকে নিজের কাছে টেনে নেন। তাদের সব দায়-দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন। তাদের দুশমনকে নিজের দুশন মনে করেন। তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তকে নিজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং চক্রান্ত বলে মনে করেন। এটা মুমিনদের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বিরাট নেয়ামত। এর দ্বারা তিনি মুমিনদের মর্যাদা এবং সম্মানকে বাড়িয়ে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে মুমিনদের ধোঁকা ও প্রতারণাকারী মুনাফিকদের বিরুদ্ধে কঠোর হুমকি প্রদান করেন। কেননা আল্লাহ্র বন্ধুদের সাথে লড়াই করতে হলে তাদেরকে খোদ্ আল্লাহ্র সাথে লড়াই করতে হবে। এই জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলে তাদেরকে খোদ্ আল্লাহ্র শত্রুতা ও প্রতিরোধের ঝুঁকি কাঁধে নিতে হবে।

প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এরকম আচরণের লোকদের বিচরণ সকল সময় সকল যুগে লক্ষ্য করা যায়। সারা দুনিয়ায় মুসলমানদের মধ্যে এক শ্রেণীর কপোট মুনাফিক মুসলমানের অবস্থান দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশও মুসলমান নামধারী- যারা বাম রাজনীতির সাথে জড়িত ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী এবং তথাকথিত কমিউনিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এ আচরণ দেখা যায়। যা তৎকালীন সুবিধাবাদী মুসলমান মুনাফিকদের আচরণের সাথে মিল পাওয়া যায়। তারা ইসলাম এবং মুসলমানদের তাহজীব ও তামাদ্দুনের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে প্রকৃত মুসলমানদের বোকা বানিয়ে বিভিন্ন সময় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকে। কিন্তু এতে তাদের দুনিয়া এবং আখেরাতের পরিণতি যে অত্যন্ত ভয়াবহ তা তাদের অনুভূতিতে ধরা পড়ে না।

মুনাফিকরা কি কারণে এই ব্যর্থ অপচেষ্টা এবং নিস্ফল প্রতারণায় লিপ্ত হয় তার জবাব হচ্ছেঃ

فِى قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ-

(আসল কথা হচ্ছে) **এদের মনের মধ্যে আছে মারাত্মক রোগ, অতঃপর আল্লাহ্ তাদের এই মনের রোগকে আরো বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে পীড়াদায়ক আযাব। কেননা তারা ছিলো মিথ্যাবাদী।**

তাদের মনে রয়েছে রোগ এখানে রোগ বলতে মুনাফিকীর ব্যাধি বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ নিজের মনের কথাকে প্রকাশ করার হিম্মত না করা। এটা হচ্ছে মনের বড় রকমের রোগ।

আল্লাহ্ সেই রোগ আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। এর অর্থ হলো-আল্লাহ্ মুনাফিকদের শাস্তি সংগে সংগে দেন না। বরং তিনি তাদেরকে যথেষ্ট সুযোগ ও স্বাধীনতা দেন। এর ফলে মুনাফিকরা তাদের চালবাজি, কূটকৌশল ও প্রতারণা বাহ্যিক ভাবে সফল হতে দেখে তারা আরও বেশী

www.icsbook.info

বেশী মুনাফিকীতে জড়িয়ে পড়ে। রোগ যেমন রোগকে বৃদ্ধি করে, তেমনি তাদের এই মানসিক রোগ মুনাফিকী তৎপরতা আরও বৃদ্ধি করে দেয়। আল্লাহ্ তাআলা তাদের পরিণতি সম্পর্কে বলেনঃ **তাদের এই মিথ্যাচারিতার জন্য রয়েছে পীড়াদায়ক শাস্তি। মনে এক আর মুখে আর এক** এটা হলো বড় ধরনের মিথ্যাচার। যেহেতু তারা মনের মধ্যে কুফরী রেখে দুনিয়ার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার জন্য বাহ্যিকভাবে ঈমানের দাবী করতো। এর দ্বারা মুসলমানদেরকে ধোঁকা দিতো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা কাফের। তাদের মৌখিক এই দাবী এবং আচরণ এক ধরনের বড় প্রতারণা ও মিথ্যাচার। তাই আল্লাহ্ তাআলা তাদের এই মিথ্যাচারিতার জন্য পরকালে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি দেবেন, যা হবে মুনাফিকদের জন্য অত্যন্ত পীড়াদায়ক। আল্লাহ্ তাআলা সূরা নিসা এর ১৪৫ নম্বর আয়াতে মুনাফিকদের শাস্তির কথা উল্লেখ করে বলেনঃ

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে। অর্থাৎ জাহান্নামের যে ৭টি স্তর আছে তার মধ্যে সবচেয়ে নিম্ন এবং নিকৃষ্ট স্তরে মুনাফিকদের অবস্থান হবে। অর্থাৎ কাফেরদের চেয়েও মুনাফিকদেরকে কঠিন শাস্তি আল্লাহ্ পাক দেবেন।

এর পর তাদের আচরণ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِى الْاَرْضِ قَالُوْا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ - اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ -

তাদেরকে যখন বলা হয়, তোমরা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না। তখন তারা বলে, 'আমরাই তো শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী। সাবধান! তারাই হলো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী। কিন্তু তারা তা বোঝেনা।

ঈমানের দাবীর নামে ভন্ডামি ও দ্বিমুখী আচরণে লিপ্ত এই মুনাফিক গোষ্ঠী বিশেষ করে তাদের মধ্যে যারা নেতৃস্থানীয় এবং মহানবী (সাঃ)-এর

হিজরতের পূর্বে যারা মদীনায় নিজের গোত্রের উপর প্রভাব রাখতো ও নেতৃত্ব দিতো, যেমন, আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই। তাদের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিলো গোয়ার্তুমি করা, নিজেদের আকাম-কুকামের পক্ষে সাফাই গাওয়া এবং কোনো জবাবদিহির আশংকা না থাকায় আত্মতৃপ্তি ও আত্মতুষ্টি বোধ করা। তারা যে শুধু মিথ্যাচার ও ধোকাবাজীতে লিপ্ত হয়েই ক্ষান্ত থাকতো তা নয়, বরং নির্বুদ্ধিতা ও অহমিকার বসবতী হয়ে বড় বড় দাবীও করে বসতো। যখন তাদেরকে বলা হতো, তোমরা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না। তখন তারা শুধু নিজেদেরকে নির্দোশ দাবী করেই ক্ষান্ত থাকতো না, বরং আত্মতৃপ্তির সাথে নিজেদের অপকর্মের সাফাই গেয়ে বলে বসতো, আমরাই তো দুনিয়াতে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে জড়িত আছি।

সন্ত্রাস, অপকর্ম, অনাচার এবং দুর্নীতিতে জড়িত থেকে নিজেদেরকে সংস্কারবাদী এবং সন্ত্রাস নির্মূলকারী বলে দাবীদার মানুষের সংখ্যা কোন যুগেই কম নয়। বর্তমানে আমাদের দেশেও এধরনের দলের নেতা এবং কর্মী বাহিনী পাওয়া যায়, যারা দুর্নীতি, সন্ত্রাস, বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টির কাজে পরাঙ্গম হবার পরও নিজেদেরকে সন্ত্রাস নির্মূলকারী, সংস্কারবাদী এবং দেশ ও জাতির হিতাকাঙ্খী বলে দাবী করে থাকে।

মুনাফিকদের এই অযৌক্তিক এবং মিথ্যা দাবীকে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ্ পাক বলেনঃ **মনে রেখ, তারাই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী। কিন্তু তা তাদের অনুভূতিতে ধরা পড়ে না।**

অতঃপর আল্লাহ্পাক মুনাফিকদের আরও একটি আচরণের কথা উল্লেখ করে বলেনঃ

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ–

আবার যখন তাদেরকে বলা হয়, অন্য লোকেরা যেমনভাবে খাটি

www.icsbook.info

ঈমান এনেছে, তোমরাও সেভাবে ঈমান আনো। তখন তারা উত্তর দেয়, আমরা কি বোকা লোকদের মতো ঈমান আনবো ? তোমরা জেনে রাখো, আসলে কিন্তু তারাই বোকা। তবে তারা তা জানে না।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ

অন্যান্য লোকেরা যেভাবে ঈমান এনেছে সেভাবে তোমরাও ঈমান আন। এখানে তাদের মতো ঈমান আনো বলতে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে যারা তৎকালে মদীনায় রাসূলের উপস্থিতিতে একনিষ্ঠ এবং খালেসভাবে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনেছিলো। যাদের মধ্যে ছিলো না সামান্য পরিমাণ দুনিয়ার খেয়াল। যাদের ঈমানের পেছনে ছিলো একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং আখেরাতের নাযাত। এরাই ছিলেন রাসূলের সংগী সাথী। যাদেরকে সাহাবী বলা হয়। এখানে মুনাফিকদেরকে সেই সব আন্তরিক এবং নিষ্ঠাপূর্ণ ঈমানদার সাহাবীদের মতো ঈমান আনার জন্য বলা হয়েছে। একথা জেনে রাখা দরকার যে, সারা দুনিয়ার এবং সকল যুগের ঈমানদার মুসলমানদের জন্য 'মডেল' হলেন রাসূলের সাহাবীরা। যাদের প্রতি আল্লাহ্ রাজি–খুশী ছিলেন।

قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَاۤءُ

তখন তারা বলে, আমরা কি নির্বোধ বোকা লোকদের মতো ঈমান আনবো ?

মদীনার মুসলমানেরা যে ভাবে রাসূল (সাঃ)-এর নিকট আত্মসমর্পণ করেছিলো এটা মুনাফিকদের কাছে মনোপুত ছিলো না। এটাকে তারা গরীব, নাখাওয়া লোকদের জন্য উপযোগী এবং তাদের মতো ধনী, নেতৃস্থানীয় মর্যাদাবান লোকদের জন্য অনুপযোগী মনে করতো। এজন্যই তারা বলতে পেরেছিলো, আমরা কি ঐসব নির্বোধ বোকা লোকদের মতো ঈমান আনবো ?

তাদের এই কথা এবং মনোভাবের কারণে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নিষ্ঠুর জবাব ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত শুনতে হয়েছিলো। আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ–

শুনে রাখ, তারাই আসলে নির্বোধ, বোকা। কিন্তু তাদের তা বুঝে আসে না।

প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! বর্তমান সময়েও আমরা অনুরূপ এক শ্রেণীর লোকদের অবস্থান দেখতে পাই। আল্লাহ্‌র বিধান কুরআনকে নিজেদের জীবন বিধান হিসেবে যারা মানতে চায়, তার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করে, তাদের সহজ-সরল জীবন এবং সততাকে দেখে তারা বোকামী মনে করে। যখন তাদেরকে পুরোপুরি ইসলামকে জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করার জন্য আহবান জানানো হয়, তখন তারা নিজেদেরকে দুনিয়ার জন্য উপযোগী, চতুর-চালাক, বুদ্ধিমান এবং প্রগতিবাদী বলে মনে করে। আর প্রকৃত ঈমানদারদেরকে দুনিয়ার জন্য অচল, বোকা, পশ্চাদপদ, মৌলবাদী এবং সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়ে নিজেদেরকে দূরে রাখতে চায়।

আসলে নির্বোধ কবেই বা নিজেকে নির্বোধ মনে করে ? এর পরই আসছে আলোচ্য আয়াতের মধ্যে মুনাফিকদের সর্বশেষ আচরণের বিবরণ। আর তা হলোঃ

وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ

তারা যখন ঈমানদার লোকদের সাথে মিশে তখন বলে আমরা ঈমান এনেছি। আর যখন তারা নিরিবিলিতে তাদের শয়তানদের (ইহুদী নেতৃবৃন্দের) সাথে মিলিত হয়, তখন তারা বলে, আসলে আমরা তো তোমাদের সংগেই আছি। আমরা তাদের (মুসলমানদের) সাথে কেবল উপহাস করিমাত্র।

কেউ কেউ শঠতাকে বাহাদুরী এবং ধোকাবাজিকে চালাকি ও দক্ষতা মনে করে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা দুর্বলতা ও নোংরামী ছাড়া আর কিছুই নয়। বাহাদুর ও ক্ষমতাশীল ব্যক্তি কখনো প্রতারক, নীচ, নোংরা,

www.icsbook.info

বিশ্বাসঘাতক ও কুচক্রী হতে পারে না। মুনাফিকরা মুসলমানদের সামনে নিজেদের-কাফেরদের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করতে ভয় পেতো এবং তাদের সাথে দেখা-স্বাক্ষাৎ হলে মুসলমান সুলভ আচরণ করতো। এ আচরণ দ্বারা তারা দু'টো সুবিধা ভোগ করতো। একদিকে তারা মুসলমানদের রূঢ় ও কষ্টদায়ক আচরণ থেকে রক্ষা পেতো। অপরদিকে এই ভন্ডামীপূর্ণ ঈমানের প্রদর্শনীকে মুসলমানদের ক্ষতি করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতো।

এখানে তাদের **শয়তান** বলতে মানুষরূপী শয়তান **ইহুদী সর্দারদেরকে** বোঝানো হয়েছে। কেননা এরা ছিলো ইসলামের বিরোধিতায় সবার আগে। আর এই সুযোগে মুনাফিকরা এদেরকে নিজেদের বন্ধু, আশ্রয়দাতা এবং.পৃষ্ঠপোষক মনে করতো। তাই এই কুচক্রী ইহুদী শয়তানদের সাথে দেখা হলে মুনাফিক নামধারী ভন্ড মুসলমানেরা এই বলে আস্বস্ত করতো যে, আমরা তো আসলে তোমাদেরই সংগী-সাথী। মুমিনদেরকে যে হাব-ভাব দেখায় ওটা তাদের সাথে আমাদের তামাশা এবং ঠাট্টা বিদ্রুপ মাত্র।

মুনাফিকদের এ ধরনের নোংরামী আচরণের প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তায়ালা বলেনঃ

اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ

আল্লাহ্ই তাদের সাথে তামাশা করছেন এবং তাদেরকে অবাধ্যতার মধ্যে উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ দিচ্ছেন।

মুনাফিকদের এই জঘন্য কথাবার্তা এবং আচরণের জন্য তাদেরকে কঠিন হুমকি প্রদান করে বলেনঃ আল্লাহ্ই তাদের সাথে তামাশা করছেন। আকাশ ও পৃথিবীর মালিক আল্লাহ্ যার সাথে তামাশা করেন তার থেকে হতভাগা আর কে আছে ? এ এমন এক ভীতিকর এবং আতংকজনক দৃশ্য যা দেলকে কাঁপিয়ে তোলে।

وَيَمُدُّهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ-

www.icsbook.info

এবং তাদেরকে অবাধ্যতার মধ্যে উদভ্রান্ত অবস্থায় ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ দিচ্ছেন।

এ কথার মানে হলো এই যে, আল্লাহ্ তাদেরকে লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন ও নির্দেশনাহীন ভাবে ঘুরে বেড়ানোর জন্য ছেড়ে দেন। পরিশেষে আল্লাহ্র হাতেই তারা ধরা খেয়ে যায়। যেমন একদল হাড় জিরজিরে ইঁদুর খাঁচার ভেতর লাফালাফি করে, আর খাঁচার মালিক সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা ও খেয়াল থাকেনা। এটা হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার ভয়াবহ তামাশা। মুমিনদের সাথে মুনাফিকদের তুচ্ছ এবং দুর্বল তামাশার মতো নয়। এতে বোঝা যায় যে, মুনাফিকরা আসলে কাফেরদের দোশর। এরা বক ধার্মিক, বর্ণচোরা, ইসলাম এবং মুসলমানদের চরম দুষমন। এরা ইসলাম এবং মুসলমানদের ক্ষতি করার জন্যই কেবলমাত্র মুসলমানদের তালিকাভুক্তি থেকে উঠাবসা করে।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ-

তারাই হেদায়েতের বিনিময়ে গোমরাহী খরিদ করে নিয়েছে। কিন্তু তাদের এই বেচা-কেনা লাভজনক হয়নি এবং তারা সঠিক পথেও পরিচালিত হয়নি।

আল্লাহ্ তাআলা নবী (সাঃ)-এর মদীনায় হিজরতের দ্বারা তাদেরকে হেদায়েতের মুক্ষম সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তারা যদি চাইতো, তবে হেদায়েত পেতো। কিন্তু তারা হেদায়েতের পরিবর্তে গোমরাহী খরিদ করেছে। ফলে তা লাভজনক হয়নি এবং তারা সৎপথও পায়নি।

মুনাফিকদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক আল-কুরআনের অন্যান্য বেশকিছু স্থানে উল্লেখ করেছেন, যেমনঃ সূরা বাকারার ৭৫-৭৬ এবং ২০৪-২০৬, সূরা নিসা- এর ৬০-৬২, ৭২-৭৩, ৮১,৮৮-৮৯, এবং ১৩৮-১৪৫, সূরা তাওবা- এর ৬৭, সূরা আনকাবুতের ১০-১১, সূরা আহযাবের ১২-১৩, এবং ১৮-২০, সূরা হাশরের ১১-১৭, সূরা

মুনাফিকুনের-১-৮, সূরা হজ্ব এর-১১, এবং সূরা তাহরীমের ৯ নম্বর আয়াত সমূহে। কুরআনের আয়াত ছাড়াও হাদীসে মুনাফিকদের চারটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আবু হুরাইরা বর্ণিত হাদীসে তিনটি এবং হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমরের বর্ণিত হাদীসে আলামত হিসেবে চারটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে। যেমনঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرٍ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ (ص) اَرْبَعٌ مَّنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا، اِذَا اُئْتُمِنَ خَانَ وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ-রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তির মধ্যে (নিম্নের) চারটি দোষ থাকবে সে খাঁটি মুনাফিক। আর যার মধ্যে যে কোনো একটি দোষ থাকবে, তার মধ্যে মুনাফিক হবার স্বভাব বিদ্যমান; যতক্ষণ না সে সেই দোষ হতে মুক্ত হয়। তা হলো- (১) আমানত রাখা হলে তা সে খেয়ানত করে, (২) কথা বললে মিথ্যা বলে, (৩) ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে এবং (৪) ঝগড়া-বিবাদ করলে অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে। (বুখারী-মুসলিম)

প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! দারসের আলোচ্য আয়াতগুলোর মধ্যে মুনাফিকদের যেসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে তা ছিলো মদীনার মুনাফিকদের বাস্তব চিত্র। কিন্তু যদি আমরা স্থান ও কালের গন্ডি পার হয় তাহলে দেখবো, সকল যুগের সকল মানব বংশের মধ্যে এই শ্রেণীর মুনাফিক লোকদের অবস্থান। আমরা এই শ্রেণীর মুনাফিক লোকদের অবস্থান বেশীর ভাগ সমাজের উচ্চ শ্রেণীর লোকদের মধ্যে দেখতে পাই। সত্যকে সত্য হিসেবে মেনে নেবার মতো সৎ সাহস তাদের নেই। আবার খোলাখুলি ভাবে তাকে অস্বীকার করার দুঃসাহসও

www.icsbook.info

তাদের নেই। আবার সাধারণ মানুষের উপর তাদের একটা পজিশান থাকা চাই। তাই কুরআনের এ জাতীয় বক্তব্যগুলোকে কোনো এক নির্দিষ্ট সময় বা যুগের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা ঠিক হবে না। কেননা কুরআনের কোনো বিধান বা উপদেশ কোনো একটা নির্দিষ্ট সময় বা যুগের জন্য নাযিল হয়নি। কুরআনের প্রতিটি আদশে-নিষেধ এবং উদাহরণ সকল যুগের সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। এটা কেয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত বলবত থাকবে। তাই কুরআনের এই আয়াতে বর্ণিত তৎকালীন মুনাফিকদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যদি বর্তমান বিশ্বে বিশেষ করে আমাদের এই দেশের মুসলমানদের মধ্যে মিলিয়ে দেখি তাহলে আমরা তাই দেখতে পাই।

শিক্ষাঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত মুনাফিকদের চরিত্র বা আচরণ কেমন হবে তা আমরা অত্র দারস থেকে জানতে পারলাম। এখন দারস থেকে আমাদের জন্য কি কি শিক্ষনীয় রয়েছে তা উল্লেখ করছিঃ

❒ মুখে মুখে ঈমানের দাবী করলেই প্রকৃত ঈমানদার হওয়া যায় না। ঈমানদার হতে হলে ইসলামের যাবতীয় বিষয়ের উপর আন্তরিক বিশ্বাস, বিশ্বাস অনুযায়ী মুখে স্বীকার এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে হবে।

❒ মুনাফিকরা মুসলমান নয় বরং জঘন্য কাফের। সুতরাং তা থেকে এবং তাদের থেকে সদাসর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। আর মুনাফিকী ত্যাগ করে খাঁটি মুসলমান হতে হবে।

❒ মুনাফিকী বা কপোটতা মারাত্মক মানসিক রোগ। যা মানসিক প্রশান্তি নষ্ট করে এবং শারিরীক দিক দিয়েও ক্ষতি সাধন করে। মুনাফিকী কুফরীর চেয়েও ধ্বংসাত্মক। সুতরাং এই আচরণ থেকে দূরে থাকতে হবে।

❒ মিথ্যাচারিতা হলো জঘন্য অপরাধ এবং নিকৃষ্ট কাজ। বিধায় তা থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা মিথ্যাচারীতা মুনাাফিকদের চরিত্র।

❒ মুনাফিকদের কার্যকলাপ প্রকৃত পক্ষে দুনিয়াতে ফেৎনা–ফাসাদ এবং বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে, তা অনুধাবন করে এ ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টিকারী আচরণ থেকে দূরে থাকতে হবে।

www.icsbook.info

❐ সাহাবাগণই ঈমানের কষ্টি পাথর। সুতরাং নিজেদের ঈমানকে তাদের ঈমানের অনুরূপ করতে হবে।

❐ খাঁটি মুসলমানদের চাল-চলন এবং উঠা-বসা দেখে তাদেরকে নীচ্ বোকা বা দুনিয়ার জন্য অচল মনে করে নিজেকে বেশী উঁচু দরের লোক, পন্ডিত এবং বুদ্ধিমান মনে করে অহমিকা প্রদর্শন করা থেকে দূরে থাকতে হবে। কেননা এটা ঈমানের লক্ষণ নয় বরং মুনাফিকীর লক্ষণ।

❐ দ্বিমুখী নীতি পরিহার করে প্রকৃত মুসলমানদের দলভুক্ত হতে হবে।

❐ যারা দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করে মুসলমানদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে এবং ক্ষতি করতে চায়, আল্লাহ্ তাদেরকে হেদায়েত দেন না বরং তাদেরকে দুনিয়া এবং আখেরাতে লাঞ্ছিত করে থাকেন।

❐ ব্যবসা মানুষ লাভের জন্য করে থাকে। কিন্তু মুনাফিকীর এই ব্যবসা লাভজনক বা কল্যাণকর নয়, বরং ক্ষতিকর। কেননা তারা হেদায়েতের বিনিময়ে গোমরাহী বা পথভ্রষ্টতাকে খরিদ করে। এটা দুনিয়া এবং আখে-রাতের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক। সুতরাং আমাদেরকে মুনাফিকী পরিহার করে সঠিকভাবে ইমান এনে ইসলামের যাবতীয় কার্যক্রম আঞ্জাম দিয়ে খাঁটি মুসলমান হতে হবে।

আহবানঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে আলোচ্য আয়াতের যে আলোচনা পেশ করলাম, এতে যদি আমার অজান্তে কোনো ত্রুটি হয়ে যায়, তার জন্য আমি আল্লাহ্পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর এ আয়াতগুলো থেকে আল্লাহ্পাক মুনাফিকদের মুনাফিকীরি যেসব পরিচয় তুলে ধরেছেন তা থেকে আমরা সবাই যেন মুক্ত হয়ে খাঁটি মুমিন-মুত্তাকী মুসলমান হতে পারি সে তৌফিক কামনা করে শেষ করছি। **অয়া আখেরু দাওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন।**

www.icsbook.info

রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়। - আল হাদীস

লেখকের অন্যান্য বই

দারসে হাদীস-১ম খন্ড

দারসে হাদীস-২য় খন্ড

দারসে কুরআন-১ম খন্ড

দারসে কুরআন-২য় খন্ড

দারসে কুরআন-৩য় খন্ড

দারসে কুরআন-৪র্থ খন্ড

ইসলামী সংগঠন ও প্রশিক্ষণ

বিষয়ভিত্তিক নির্বাচিত হাদীস

আল কুরআনে মানব সৃষ্টি তত্ত্ব

রাসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) রূহানী নামায

বিষয়ভিত্তিক কুরআন হাদীস সংকলন

বাংলা উচ্চারণসহ ১০০ মাসনুন দোয়া

কুরআন হাদীসের আলোকে ৫দফা কর্মসূচী

ফাযায়েলে ইক্বামাতে দ্বীন বা দ্বীন প্রতিষ্ঠার (চেষ্টার) মর্যাদা

সাহাল প্রকাশনী

সাহাল প্রকাশনী